ইউনিট ১৩

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ কৃষি, পশু ও মৎস্য

এ ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ কৃষি, পশু এবং মৎস্য সম্পদ নিয়ে আলোচনা করবো। আমাদের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের সম্পদ সমূহের বর্তমান অবস্থা ও ভৌগোলিক বন্টন সম্পর্কে ধারনা দেওয়া।

পাঠ-১৩.১ ঃ বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূমি ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা পাবেন;
- ☞ বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা সমূহের ভূমি ব্যবহারের পরিসংখ্যান জানতে পারবেন;
- ☞ নগর ও পল্লী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

প্রথমেই আমরা বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। ভূমি ব্যবহারের ধরণ থেকে একটি দেশের অর্থনৈতিক চিত্র সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারে গতিশীলতা

১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম ইস্যু এবং বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহুদিনের দাবী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য ১৯৩৮ সালে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল পূর্ব বাংলা বিধান পরিষদের পূর্ব বাংলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল পাশ করে। ১৯৫০ সালে ''স্টেট একুজিশন'' আইন পাশ করে ক্ষতিপূরণ সহ জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয় এবং কিছু কিছু ব্যাপারে সংস্কার সাধন করা হয়।

> ১৯৫০ সালের ''স্টেট একুজিশন'' আইন পাশ করে ক্ষতিপূরন সহ জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

এ দীর্ঘ সময়ে ভূমি বিন্যাস, ব্যবহার, নিবিড়তা বৃদ্ধি, রূপান্তর, উৎপাদন এবং ভূমির উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে কেউই তেমন নজর দেয়নি। দীর্ঘ কাল ধরে ভূমি ব্যবহারে স্থবিরতা বিরাজ করছিল।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে পরিবর্তন আসে তা এদেশের ভূমি ব্যবহার কে প্রভাবিত করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন- যতই দিন যাচ্ছে এক ফসলী, দো-ফসলী জমির পরিমান কমে গিয়ে সে গুলো তিন-ফসলী ও মিশ্র ফসলীতে পরিণত হচ্ছে।

ভূমি ব্যবহারের এরূপ পরিবর্তনের কারণ গুলো হচ্ছেঃ

- ভূমির উপর জনসংখ্যার প্রচন্ড চাপ
- আনুভূমিক বসতি বিস্তার
- যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন
- শ্রমের পরিপূর্ণ ব্যবহার
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
- সেচ সুবিধা
- শিল্প প্রশিক্ষণ
- সম্পদ সচেতনতা।

> ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের কারণগুলি কি কি?

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার

বাংলাদেশের মোট এলাকা ১,৪৩,৯৯৯ বর্গ কিঃ মিঃ (৫৫,৫৯৮ বঃ মাঃ) এর মধ্যে ৯,৩৮৪ বঃ কিঃ মিঃ (৩,৬২৩ বঃ মাঃ) জল ভাগ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন। এ দেশে প্রতি বছর মানুষ-ভূমির অনুপাত আশংকাজনক ভাবে কমে আসছে। কৃষি নির্ভর দেশ হিসেবে উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার এ দেশে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়। নিম্নের সারণীতে (১৩.১) ১৯৯৪-৯৫ সালের ভূমি ব্যবহার দেখানো হলোঃ

> - বাংলাদেশের মোট এলাকার ৯,৩৮৪ বর্গ কি.মি. জলভাগ।
> - জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৫০ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।

সারণী ১৩.১ ঃ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার (১৯৯৪-৯৫)

ভূমি ব্যবহার	জমির পরিমান (হাজার একর)
বনাঞ্চল	৪৮৬১
চাষের অযোগ্য	১০১২৮
চাষযোগ্য পতিত	১৫৪৭
বর্তমান পতিত	১০০১
নীট চাষযোগ্য জমি	১৯১৩৩
মোট চাষযোগ্য জমি	৩৩৪১৩

উৎস ঃ বি.বি.এস, ১৯৯৭

১৯৭১-৭২ সালে মোট কৃষিজ ভূমি ছিল ২৮১৬৯ একর। ইহাই ১৯৯৪-৯৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৩৪১৩ একর। এ ক্ষেত্রে মোট চাষের ভূমি বেড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে, এই জন্য বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দিতে বনাঞ্চল উজাড় করে চাষের ভূমি বাড়ানো হয়েছে।

১৯৭১-৭২ সালের ও ১৯৯৪-৯৫ সালের ভূমি ব্যবহার লক্ষ্য করলে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নের সারণীতে ১৯৭১-৭২ ও ১৯৯৪-৯৫ সালের ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপিত হলোঃ

সারণী ১৩.২ ঃ ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের ভূমি ব্যবহারের তুলন (হাজার একর)

ভূমি ব্যবহার	১৯৯৭১-৭২	১৯৯৪-৯৫
	জমির পরিমান	জমির পরিমান
বনাঞ্চল	৫৫০৭	৪৮৬১
চাষের অযোগ্য	৬৫৬৬	১০১২৮
চাষযোগ্য পতিত	৭৩৪	১৫৪৭
বর্তমান পতিত	২১০১	১০০০
নীট কর্ষিত	১০৩৭১	১৯১৩৩
মোট কর্ষিত	২৮১৬৯	৩৩৪১৩

উৎস ঃ বিবিএস, ১৯৯৭

দেশ ব্যাপী ভূমি ব্যবহারের এ সার্বিক চিত্র থেকে দেখা যায় ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে বনাঞ্চলের আয়তন হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষিভূমির (কর্ষিত) আওতাধীন এলাকা বেড়েছে। একই সাথে চাষের অযোগ্য ভূমির পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জেলাওয়ারী ভূমি ব্যবহারে এ চিত্র নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশের ভূমির প্রধান ব্যবহার কি কি?

সারণী ১৩.৩ ঃবাংলাদেশের বৃহত্তর জেলাওয়ারী ভূমি ব্যবহার ১৯৯৪-৯৫ (হাজার একর)

অঞ্চল	মোট এলাকা	চাষের অযোগ্য	বনাঞ্চল	চাষযোগ্য পতিত	বর্তমান পতিত	নীট কর্ষিত এলাকা	মোট কর্ষিত এলাকা
বান্দর বন	১১০৭	২১২	৪০৭	৩৮৭	৩০	৭১	১০৬
চট্টগ্রাম	২০৩৫	৬০৭	৫৩৫	২৪২	৩৩	৬১৮	১১১০
কুমিল্লা	১৬৬০	৪৭০	০২	১৮	৩৩	১১৩৭	২২১৬
নোয়াখালী	১৫২৫	৪৪২	২৪৩	৪৮	৩৪	৭৫৮	১৩৪২
সিলেট	৩১১৩	৭৭০	১৮৯	২০৭	১৭৭	১৭৭০	২৫৭৯
ঢাকা	১৮৩৮	৭৭৬	৬৫	২৪	৩৯	৯৩৪	১৬৪০
ফরিদপুর	১৭২৬	৪৭৯	-	২০	৩২	১১৯৫	২১৮৬

অঞ্চল	মোট এলাকা	চাষের অযোগ্য	বনাঞ্চল	চাষযোগ্য পতিত	বর্তমান পতিত	নীট কর্ষিত এলাকা	মোট কর্ষিত এলাকা
জামালপুর	৮৩৯	২২৪	৩০	২১	১১	৫৫৩	১১০৪
কিশোরগঞ্জ	১৩৮০	৩৬০	০২	৫২	৫৪	৯১২	১৪৯২
ময়মনসিংহ	১০৭৮	৩৫৪	৩৯	০৬	০১	৬৭৮	১৩০৪
টাঙ্গাইল	৪৪	১০৪	১২৩	১০	১০৬	৬০১	১০৯২
বরিশাল	২০৪	৭৫৫	৩২	৭৩	৭০	১০৯০	১৮২৩
যশোর	১৬২৩	৪৪০	-	২৮	০৬	১১৪৯	২২১১
খুলনা	৩০৬২	৪৯২	১৪২৬	৭০	৫৬	১০১৮	১৩৫৮
কুষ্টিয়া	৮৬১	২৬৮	-	৩৫	১৪	৫৪৪	১০৬৫
পটুয়াখালী	১২৪৫	৩৫০	৭১	১০	০৭	৮০৭	১১৫৩
বগুড়া	৯৬০	৩২৮	০১	০৪	১৬	৬১১	১২৭২
দিনাজপুর	১৬৪৪	৪৭৪	২৬	৭৫	৮৫	৯৮৪	১৮০০
পাবনা	১২০১	৪৯০	-	৪১	১৯	৬৫১	১২৩২
রাজশাহী	২৩২৩	৭১৪	০৭	৪৫	৬৮	১৪৯৯	২৩১৮
রম্পুর	২৩৭৭	৭৪৫	০৭	৪৫	১৪৩	১৪১৮	২৪২৬
সমগ্র বাংলাদেশ	৩৬৬৬৯	১০১২৮	৪৮৫১	১৫৪৭	১০০০	১৯১৩৩	৩৩৪১৩

সারণী ১৩.৩ এ জেলাওয়ারী বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের আওতাধীন ভূমির আয়তনগত তারতম্য দেখানো হলো। এ সারণীতে লক্ষ্যণীয় যে, বান্দরবন চট্টগ্রাম ও সিলেট ব্যতীত সব জেলায় চাষযোগ্য পতিত ভূমির পরিমান খুবই কম। আরো লক্ষ্যণীয়, কুমিল্লা, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনায় বনাঞ্চলের আওতাধীন কোন ভূমি নেই। এসব জেলা ঘনবসতি সম্পন্ন, ফলে চাষযোগ্য ও বর্তমান পতিত ভূমির পরিমানও অল্প।

বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বনাঞ্চল ও চাষযোগ্য পতিত ভূমি কম?

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সমস্যা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান নেই।

বাংলাদেশের শুধুমাত্র প্রয়োজন মাফিক কিছু নমুনা জরিপের ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান ছাড়া ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান নেই বললেই চলে। এ পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে সারা বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞান সম্মত সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নীতি ও তৈরী করা হয়নি। যথেষ্ট সরকারী উৎসুচক থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন সরকারী ইচ্ছা বা বিভাগ ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত নেই। ফলে, বাংলাদেশের কোন সুনির্দিষ্ট একটি মাত্র সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান বা তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সরকারী প্রকাশনায় যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে জেলা ভিত্তিক বিশেষ শ্রেণী বিভাজনে ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান। ফলে বাংলাদেশের কোন এলাকা বা অঞ্চলে ভূমি সম্পদ কি কি খাতে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে জানা কষ্টকর।

পাঠ সংক্ষেপ

পূর্বে বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৯৫০ সালে ক্ষতিপূরন দান সহ জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি ভূমিরই প্রাধান্য। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের আওতায় বসতিই প্রধান। বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

১৩.১.২ ঃ নগর অঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার

এ পাঠে আমরা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নগর ও গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। নগর ও গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের মধ্যে সাধারনতঃ পার্থক্য থাকে, এ পাঠ থেকে আমরা এ সম্পর্কে জানবো।

নগর ভূমি ব্যবহার

নগর ভূমি ব্যবহার বলতে নগর সীমানা ভূক্ত এলাকায় নগরীয় ও অনগরীয় যাবতীয় কর্মকান্ডে ব্যবহৃত উভয় ধরনের ভূমি ব্যবহারকেই বুঝায়। নগরীয় কর্মকান্ডের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, প্রশাসন, হাসপাতাল অন্তর্ভূক্ত। অনগরীয় কর্মকান্ডের আওতাধীন হলো কৃষি, পতিত ভূমি, জলভাগ। এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে বড় শহরের তুলনায় থানা ও পৌরশহরের মত ছোট ও মাঝারী শহরগুলোতে অনগরীয় খাতে ভূমির ব্যবহার সর্বাধিক।

নগরীয় ভূমি ব্যবহারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। থানা শহর, পৌর শহর ও জেলা/বিভাগীয় শহর।

গুরুত্ব অনুযায়ী নগরীয় ভূমি ব্যবহারকে তিনটি স্তরে দেখানো যায়। যথা ঃ থানা শহর, পৌর শহর ও জেলা/বিভাগীয় শহর।

থানা শহর ঃ বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাথমিক স্তরের শহর। সাধারনতঃ পুলিশ প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার এর প্রধান ভূমি ব্যবহার। থানার আওতাভূক্ত গ্রামগুলোতে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সেবা প্রদানই এর প্রধান কাজ। গবেষণায় দেখা গেছে, থানা শহরে আবাসস্থল হিসাবে মোট ভূমির প্রায় ১৪ শতাংশ দখল করে আছে। তাছাড়া, শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে মাত্র ১.৫ শতাংশ ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের সমস্ত থানা শহরে (৪১৫টি) প্রায় ৯ হাজার একর ভূমি শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, প্রশাসন। আর্থ-সামাজিক, জনসেবা প্রভৃতি খাতে মোট ভূমির প্রায় ৩.৫ শতাংশ জুড়ে আছে। সারণি১৩.৪ বাংলাদেশের থানা ও পৌরশহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহারের গড় আয়তন ও শতকরা হার দেখানো হয়েছে। সারণিতে এ লক্ষ্যনীয় যে, থানা শহরে কৃষি ও জলাশয় খাতেই বিপুল জায়গা জুড়ে আছে, যার পরিমান মোট ভূমির প্রায় ৭৬ শতাংশ।

পৌরশহর ঃ নাগরিক জীবনের নুন্যতম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কমপক্ষে ৫ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত বসতি পৌরশহর হিসাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের বর্তমান পৌর শহরের সংখ্যা ১২৬টি। পৌর সভার অধিকাংশ অধিবাসী অকৃষি পেশায় নিয়োজিত। পৌর শহরের ভূমি ব্যবহারের বৈচিত্রতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থানা শহর অপেক্ষা অধিকতর বৈচিত্রময়। পৌর প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য জনসেবা ইত্যাদি খাতে থানা শহরের চেয়ে উন্নততর ভূমি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আবাসিক খাতে পৌর এলাকায় মোট ১.৫ লক্ষাধিক একর ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে যা মোট ভূমির প্রায় ১৯ শতাংশ। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো থানা বা পৌরশহর উভয় ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত শিল্পায়ন না হওয়ায় বিপুল পরিমান ভূমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়।

জেলা/বিভাগীয় শহর ঃ ইহা উঁচু স্তরের নগরায়নের আওতাভূক্ত এবং অধিক নগরীয় জনসংখ্যার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ১৩.৪ ঃ বাংলাদেশের থানা ও পৌর শহরে ভূমি ব্যবহারের গড় আয়তন ও শতকরা হার

ভূমি ব্যবহার	থানা শহর		পৌর শহর	
	আয়তন (একর)	শতকরা হার (%)	আয়তন (একর)	শতকরা হার (%)
শিল্প ও বাণিজ্য	২২	১.৫	৬১	১.৫
শিক্ষা	১৫	০.৮	৩৮	১.০
স্বাস্থ্য	৬	০.৪	১২	০.৩
প্রশাসন	১৯	১.২	৬৬	১.৭
বিনোদন	৪	০.৩	৯	০.২
আর্থ-সামাজিক	৫	০.৩	১৭	০.৪
জনসেবা	৮	০.৫	১৭	০.৪
আবাসিক	২০৯	১৪.০	৭৭৫	১৯.৪
রাস্তা	৪৯	৩.৩	১৩০	৩.৩
জলাশয়	১৫৫	১০.৩	২৪	৬.১
কৃষি	৯৯১	৬৬.২	২৬০৬	৬৫.৩
অন্যান্য	১৯	১.২	১৯	০.৩
মোট	১৪৯৯	১০০	৩৯৯৩	১০০

উৎস ঃ ইউ, ডি, ডি ১৯৯০

অন্যান্য অনুন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জনসংখ্যার আকারে একটিই প্রধান নগর আছে, যা ২য় কিংবা ৩য় বড় নগর গুলোর চাইতে দ্বিগুনের বেশী। তবে শহর/নগরের আকার বা আয়তন যেমনই হোক না কেন প্রতিটি নগরভূমি ব্যবহারে সাধারন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন- সব নগরেই আবাসিক এবং বাণিজ্যিক এলাকা থাকে। একটি আদর্শ নগরের ভূমি ব্যবহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নগরীয় ভূমির সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে আছে আবাসিক এলাকা এবং এর পরই আসবে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন সমূহ ও বাণিজ্যিক এলাকা। বাংলাদেশের প্রায় সব নগরেই সব চেয়ে কম জায়গা জুড়ে থাকে খোলা জায়গা।

ঢাকা নগরের ভূমি ব্যবহারের একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। এখানে ঢাকা নগরের ভূমি ব্যবহারের মোট ৯টি ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ধরনগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। বাণিজ্যিক, ২। শিল্প, ৩। শিক্ষা ও প্রশাসনিক, ৪। খোলা জায়গা, ৫। সড়ক, রেল ও বিমান বন্দর এলাকা, ৬। আবাসিক এলাকা, ৭। অনগরায়িত এবং ৮। জলাভূমি।

নিচের সারণি ১৩.৫ এ ঢাকা নগরীর (১৯৭৫) ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ভিত্তিক বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের আওতাভূক্ত ভূমির আয়তন দেয়া হয়েছে। এসব শ্রেণী বিভাগের আওতাভূক্ত ভূমির মধ্যে আবাসিক এলাকাই শতকরা ৫০ ভাগের অধিক জুড়ে আছে। এছাড়া, প্রশাসনিক, শিক্ষা অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক (শিক্ষা-সংস্কৃতি) এর আওতাভূক্ত এলাকা প্রায় ১৯ ভাগের বেশী এবং সড়ক ও রেল পথের আয়তন শতকরা ১২ ভাগের অধিক।

সারণি ১৩.৫ ঃ ঢাকা নগরীর ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার	শতকরা হার
আবাসিক	৫০.২
বাণিজ্যিক	৫.৯
প্রশাসনিক ও হাসপাতাল	১৪.০
শিল্প	৫.৩
শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক	৩.২
সড়ক ও রেলপথ	১২.৫
পরিবহন কেন্দ্র	২.৯
খোলা জায়গা (পার্ক, খেলার মাঠ, কবরস্থান ও পতিত)	২.০

সূত্র ঃ নজরুল ইসলাম, ঢাকা শহর সুন্দরের অন্বেষা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫

ঢাকা নগর বাংলাদেশের রাজধানী, ফলে এর ভূমি ব্যবহারে বিভাগীয় জেলা শহরগুলোর চেয়ে অনেক বেশী জটিল এবং বৈচিত্রময়। সারণি ১৩.৬ এ রাজশাহী বিভাগীয় শহরের ভূমি ব্যবহারের ধরনগুলো দেখানো হয়েছে। এ সারণিতে লক্ষ্যণীয় যে রাজশাহী শহরের আবাসিক এলাকাই প্রায় ৪০ শতাংশ। এর পরই শিক্ষা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং যোগাযোগ পথ যা একত্রে প্রায় ২০ ভাগের ও অধিক। তবে, রাজশাহী শহরে অনগরীয় ও ফাঁকা জায়গা ঢাকার চেয়ে অনেক বেশী (২৬ ভাগের অধিক)। রাজশাহী শহর শিল্পে খুবই অনগ্রসর, এর আওতায় মাত্র ২.৩ ভাগ ভূমি হয়েছে।

নগরীয় এ ভূমি ব্যবহারের ধরনসমূহের সময় ও অবস্থার সাথে পরিবর্তন হতে পারে। তবে, যে কোন নগরেরই প্রধান ভূমি ব্যবহারের ধরন সমূহ বজায় থাকে। বাংলাদেশে ঢাকা নগরে রাজধানী হিসাবে যে সব নগরীয় সুবিধা গড়ে উঠেছে, অন্যান্য বিভাগীয় কিংবা জেলা শহরে সে সব সুবিধা বহুলাংশে অনুপস্থিত। ফলে, ঢাকা নগরীয় ভূমি ব্যবহার অন্য সব শহরের চেয়ে আলাদা।

সারণি ১৩.৬ ঃ রাজশাহী শহরের সাধারন ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার	মোট আয়তনের শতকরা হার
আবাসিক	৩৯.৫
বাণিজ্যিক	১.৫
শিক্ষা গবেষণা	৯.৩
অফিস ও প্রশাসনিক	৪.৩
শিল্প	২.৩
বিনোদন ও খেলার মাঠ	২.৫
যোগাযোগ ও সাধারন ব্যবহার	১১.৭
বিবিধ, অশহরীয় ও ফাঁকা জায়গা	২৬.৬৮

সূত্র ঃ শেখ ও হক (১৯৯২)

নগর অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার কি?

গ্রামীণ বা পল্লী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার

বাংলাদেশের গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। অর্থাৎ মোট ভূমির প্রধান অংশই কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশের মধ্যে বসতি উল্লেখযোগ্য। এ দুটি ভূমি ব্যবহার বাদ দিলে পতিত ভূমি ও জলাভূমি প্রায় বাকী ভূমির আওতায় চলে আসে। তবে, কোন কোন গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট বাজার আছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারে তারতম্য ঘটে থাকে। সারণি ১৩.৭ চাঁদপুর জেলার মতলব থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের ভূমি ব্যবহারের ধরন ও তাদের আওতাভূক্ত ভূমির পরিমান দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের প্রধান অংশই কৃষি।

সারণী ১৩.৭ ঃ নিশ্চিন্তপুর গ্রাম, মতলব এর ভূমি ব্যবহারের ধরনভিত্তিক ভূমির পরিমান।

ভূমি ব্যবহার	শতকরা হার
বসতি ও সংলগ্ন অকৃষি ভূমি	১১
কৃষি ক্ষেত	৪২
বাজার	১
স্কুল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল/পোষ্ট অফিস	২
পুকুর ও জলাভূমি	২২
খাল	১০
সেচ নালা	৩
গোরস্থান	১
রাস্তা/হাট	৬
খোলা জায়গা/খেলার মাঠ/চারণ ভূমি	২

উৎস ঃ মাঠ জরিপ ১৯৯৮

উপরের সারণী থেকে লক্ষ্যণীয় যে নিশ্চিন্তপুর গ্রামের ভূমি প্রধানতঃ কৃষি কাজেই ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, বসতি বাদ দিলে পুকুর ও জলাভূমিই একত্রে সবচেয়ে বেশী। নিশ্চিন্তপুর গ্রামের যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এর ভূমি ব্যবহারের ধরন অনগ্রসর গ্রামের চেয়ে তুলনামূলকভাবে উন্নত। তবে, বাংলাদেশের গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের একটি গড় চিত্র নিম্নরূপ (সারণি ১৩.৮)ঃ

সারণী ১৩.৮ ঃ বাংলাদেশের গ্রামীন ভূমি ব্যবহারের গড় পরিসংখ্যান।

ভূমি ব্যবহার	শতকরা হার
বসতি (ভিটা বাড়ি ও বসতি সংলগ্ন অকৃষিজ জমি)	১০.৩
শস্য ক্ষেত	৬০.৭
উদ্যান কৃষি	২.৬
বৃক্ষ ও বর্ষজীবি ফসলা বৃক্ষ	৯.৬
অনুন্নত চারন ভূমি	৪.২
কৃষিযোগ্য পতিত	২.০৯
জলাভূমি	৬.৮
রাস্তা/হাট	

উৎস ঃ ইসলাম ও আহসান ১৯৮৬

জনবহুল বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের সচেতনতার খুবই অভাব। সরকারীভাবে ও ভূমি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ কম। এ সমস্যা নগরীয় ভূমি ব্যবহারেই বেশী দেখা যায়। নগর প্রান্তের মূল্যবান কৃষিভূমিতে ইটের ভাটা, শিল্প স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ ও শহর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরো সচেতনতা প্রয়োজন। নতুনা দেশের খাদ্য ঘাটতি আরো বাড়বে এবং ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের আরো অবনতি ঘটবে।

পল্লী অঞ্চলের ভূীম ব্যবহার কি?

পাঠ সাংক্ষেপ

বাংলাদেশে নগরীয় ভূমি ব্যবহারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : থানা শহর, পৌর শহর, জেলা/বিভাগীয় শহর। গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারে প্রধান অংশই কৃষি। এছাড়া বসতি, হাট বাজারও রয়েছে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কম এবং সেই সংগে জনগণের সচেতনতাও কম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৩৮ সালে যে কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয় সেই কমিশনের নাম কি?
ক) ফ্লাউড কমিশন খ) ক্লাইভ কমিশন গ) ইলিয়ট কমিশন

২। জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল পাস হয় -- ।
ক) ১৯৪৭ সালের ৭ই এপ্রিল খ) ১৯৪৮ সালের ৭ই মে গ) ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল

৩। স্টেট একজিশন আইন পাশ করা হয় কত সালে?
ক) ১৯৪৯ সালে খ) ১৯৫০ সালে গ) ১৯৫১ সালে

৪। বাংলাদেশের মোট জলভাগ কত ব কি.মি.?
ক) ৯,৩৭৪ ব.কি.মি খ) ৮,৩৮৪ ব.কি.মি গ) ৯,৩৮৪ ব.কি.মি

৫। গুরুত্ব অনুযায়ী নগরীয় ভূমি ব্যবহার কে কয়টি স্তরে দেখানো হয়?
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি

৬। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাথমিক স্তরের শহর টি।
ক) ইউনিয়ন সদর খ) উপজেলা সদর গ) থানা শহর

৭। নাগরিক জীবনের নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কমপক্ষে ৫ হাজার জনসংখ্যা অধুর্ষিত বসতি --।
ক) থানা শহর হিসেবে স্বীকৃত খ) পৌর শহর হিসেবে স্বীকৃত গ) জেলা শহর হিসেবে স্বীকৃত

৮। বাংলাদেশের বর্তমান পৌর শহরের সংখ্যা কয়টি?
ক) ৩২৬টি খ) ১২৫টি গ) ১২৬টি

৯। ঢাকা নগরীর ৫০ ভাগের অধিক -- ।
ক) আবাসিক ভূমি ব্যবহার খ) বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার গ) প্রতিষ্ঠানিক ভূমি ব্যবহার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের কারণগুলো কি?
২. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা কি কি?
৩. থানা শহরের ভূমি ব্যবহার কিরূপ?
৪. জেলা/বিভাগীয় শহরের ভূমি ব্যবহার কিরূপ?
৫. ঢাকা নগরের ভূমি ব্যবহারকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
৬. গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার কিরূপ?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ভূমি ব্যবহার বলতে কি বুঝেন? বাংলাদেশের শহর এলাকার ভূমি ব্যবহারের বর্ণনা দিন।
২. বাংলাদেশের নগর ও পল্লী এলাকার ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-১৩.২ ঃ কৃষিযোগ্য ভূমির আয়তন ও বহুবিধ ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশে কৃষিযোগ্য ভূমির আয়তন ও বহুবিধ ব্যবহার জানতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশে ফসল ও কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

এ পাঠে আমরা মূলতঃ কৃষি ভূমির আয়তন এবং কৃষি ভূমির বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের মোট কৃষি ভূমির পরিমান ৩৩,৪১৩ হাজার একর (১৯৯৪-৯৫)।
১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ২৯,০৩৯ হাজার একর।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্যভাগের কিছু অঞ্চল বাদ দিয়ে সমগ্র দেশই নিম্ন প-াবন ভূমি দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের মোট কৃষি ভূমির পরিমান ১৯৯৪-৯৫ সালের পরিসংখ্যান অনুয়াযী ৩৩,৪১৩ হাজার একর।স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-৭৩ সালে এর পরিমান ছিল ২৯,০৩৯ হাজার একর; বর্তমানে এর পরিমান দাড়িয়েছে ৩৩,৪১৩ হাজার একর (১৯৯৪-৯৫)। সমগ্র দেশের কৃষিভূমির ব্যবহার এক রকম নয়। ভূমির প্রকৃতি ও প-াবনের উপর নির্ভর করে কৃষিভূমি ব্যবহারে বিভিন্নতা রয়েছে। যে সকলভূমি প-াবন মুক্ত সেই সকল ভূমিতে তিনটি ফসল চাষ করা হয়, যে সকল ভূমি বছরের অর্ধেক সময় প-াবিত থাকে সেই সকল ভূমিতে শুধু মাত্র শুস্ক মৌসুমে একটি ফসল চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের কৃষি ভূমির সামগ্রিক ব্যবহার পর্যালোচনা করলে তিন ধরনের ভূমি ব্যবহার দেখতে পাই। এগুলো হলো, এক-ফসলী, দোঁ-ফসলী, তিন-ফসলী। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও শিল্পের প্রয়োজনে কৃষি ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে, কৃষি ভূমির পরিমান ও কমে যাচ্ছে। অপর পক্ষে, বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য বনাঞ্চল ধবংস করে কৃষিভূমি বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

১৯৯৪ সালে সমগ্র বাংলাদেশে এক ফসলী ভূমি ছিল ৯৫৬৬ হাজার একর, দোঁ-ফসলী ভূমি ৯৫৩০ হাজার একর এবং তিন ফসলী ভূমি ছিল ২৩৭৫ হাজার একর। নিম্নের সারণী ১৩.৩.১ এ বাংলাদেশের প্রাক্তন জেলা গুলোর কৃষিযোগ্য ভূমির বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের পরিমান দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.৯ ঃ ১৯৯৪-৯৫ সালের কৃষিযোগ্য ভূমির বহুবিধ ব্যবহার (হাজার একর)

অঞ্চল	এক-ফসলী	দোঁ-ফসলী	তিন-ফসলী
বান্দর বন	৪২	২৩	০৬
চট্টগ্রাম	২০০	৩৪৪	৭৪
কুমিল্লা	২৬৫	৬৬৫	২০৭
খাগড়াছড়ি	২১	১৪	০৪
নোয়াখালী	২৯৫	৩৪২	১২১
রাঙ্গামাটি	৭৩	১৯	০৪
সিলেট	১২১	৬১৯	৯৫
ঢাকা	৩৪৩	৪৭৩	১১৫
ফরিদপুর	৩৯৩	৬১৩	১৮৯
জামালপুর	৯৮	৩৫৯	৯৬
কিশোরগঞ্জ	৪০২	৪৪০	৭০
ময়মনসিংহ	১৩০	৪৭০	৭৮
টাঙ্গাইল	২০৫	৩০১	৯৫
বরিশাল	৪৯২	৪৬৩	১৩৫
যশোহর	২৬৪	৭০৮	১৭৭
খুলনা	৭১৯	২৫৮	৪১
কুষ্টিয়া	১০৫	৩৫৭	৮২
পটুয়াখালী	৪৯৫	২৭৬	৩৫
বগুড়া	৭৭	৪০৭	১২৭
দিনাজপুর	৩৪২	৫০২	১৫৬
পাবনা	১৮৫	৩৫১	১১৫
রাজশাহী	৭৮৮	৬০৩	১০৮
রম্পুর	২৫৫	৯১৮	২৪৫

উৎস ঃ বিবিএস, ১৯৯৭

উপরের সারণীতে লক্ষ্যনীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় সার্বিকভাবে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমান সবচেয়ে কম। আবার, উপকূলীয় জেলাগুলোতে, যেমন- বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় এক ফসলী ও দুই ফসলী জমি তুলনামূলকভাবে বেশী। সেই তুলনায় তিন ফসলী জমির পরিমান কম। সিলেট, কিশেরাগঞ্জ, কুমিল্লা, যশোহর, রাজশাহী ও রম্পুর জেলাসমূহ দুই ফসলী ভূমির আধিক্য বেশী। আবাদযোগ্য ভূমির ফসলের এ নিবিড়তা বহুলাংশে ভূমির উচ্চতা, প-াবন গভীরতা ও মৃত্তিকার গুনাগুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৩.২.১ কৃষির গুরুত্ব

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫৬% সরাসরি কৃষি কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল।
- জিএনপি-র ৩৮ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলী কৃষি। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক। অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ সরাসরি কৃষি কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল এবং মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) -এর শতকরা ৩৮ ভাগ কৃষি খাত থেকে আসে (World Geographic Encyclopedia, 1995)। নিম্নোক্ত কারণ গুলোর জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিকঃ

১. **প্রধান পেশা** ঃ বাংলাদেশের জন সাধারনের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। জনসংখ্যার ৮০% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসাধারনের জীবন যাত্রার মান কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে ।

২. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি** ঃ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ আসে কৃষি থেকে। তাই বলা যায় কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আয়ের প্রধান উৎস এবং জাতীয় আয়ের মূল ভিত্তি।

৩. **খাদ্যের যোগান** ঃ যদিও কৃষি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস তবুও বাংলাদেশের কৃষিকে স্বয়ংভোগী কৃষি বলা হয়। কারণ কৃষকেরা নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মিটানোর পরে বাড়তি ফসল বিক্রি করে তাই কৃষি বাংলাদেশের খাদ্য যোগানের প্রধান উৎস।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন** ঃ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম উৎস কৃষিভিত্তিক পণ্য। এসব পণ্যে মধ্যে হিমায়তি চিংড়ি অন্যতম। এরপরই আসে পাট, পাটজাতদ্রব্য, চা, তামাক ও অপ্রচলিত কৃষি পণ্য, যেমন- তরকারী, মসলা, উন্নতমানের চাউল ইত্যাদি।

৫. **শিল্পের কাঁচামাল** ঃ বাংলাদেশের শিল্পও কৃষির উপরে নির্ভরশীল। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষি হতেই পাওয়া যায়। তাই বলা যায় শিল্পের উন্নতিতে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে তার মধ্যে অধিক চিনি কল, পাট কল, কাগজ ও মন্ড কল ডেয়ারী ফার্ম, চা শিল্প, রেশম ও সূতা ভিত্তিক বস্ত্রকল ইত্যাদি।

৬. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন** ঃ কৃষি বাংলাদেশে খাদ্যের যোগান দেয় অন্যদিকে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের আয় বৃদ্ধি করে। ফলে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

৭. **রাজস্ব বৃদ্ধি** ঃ কৃষি পণ্য ও ভূমির উপরে সরকার কর আরোপ করে প্রচুর রাজস্ব পায়। তাই সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **সমন্বিত শিল্পায়ন** ঃ কৃষির ওপরে নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে যেমন- খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল, নারায়ণগঞ্জের পাট শিল্প, পাকশীতে কাগজ কল।

৯. **জ্বালানী সরবরাহ** ঃ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের জ্বালানীর বেশীর ভাগ অংশ কৃষিখাত সরবরাহ করে। কৃষি হতে প্রাপ্ত খড়, বিচালী, বাঁশ, গোলপাতা প্রভৃতি জ্বালানী সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১০. **জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি** ঃ কৃষি ফলন ভালো হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে, শিল্পের কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের উৎপাদনও বাড়ে এতে জাতীয় উৎপাদন বাড়ে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত এবং খাদ্যের প্রধান উৎস কৃষি। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘন বসতি পূর্ণ দেশ এবং জন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমান বেশী। চাষাবাদ উপযোগী জমির পরিমান কম হওয়ায় ১৯৫০ সাল থেকে এদেশে প্রায় খাদ্যাভাব

লেগেই রয়েছে এবং খাদ্য ঘাটতি বছরের পর বছর বেড়েই চলছে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে তবে তা বর্ধিত জন সংখ্যার সংঙ্গে তাল মিলাতে পারছে না।

বাংলাদেশ শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক লোক গ্রামে বাস করে এবং এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের পেশা হলো কৃষি। ৬০ হাজারের ও অধিক গ্রামে ৬৫ লাখের ও বেশী খামার বাড়ী আছে। গড় পড়তা প্রত্যেক খামার বাড়ীতে ৬ জন লোক বাস করে থাকে। গড়পড়তা ৩ জন লোক প্রত্যেক কৃষি পরিবারে কাজ করে থাকে। খামারের আয়তন খুব ছোট এর চেয়ে ছোট হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। তবে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে আশংকা করা হচ্ছে খামারের আকৃতি আরোও ছোট হবে।

বাংলাদেশের কৃষির গুরুত্ব কি?

১৩.২.২ ফসল ও কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অধিক উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে ফসল ও কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। এ পাঠে আমরা ফসল ও কৃষি পদ্ধতি এবং এর পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবো।

ফসল ও কৃষি পদ্ধতি

যে পদ্ধতি অনুসরন করে একটি জমিতে এক বছরে বিভিন্ন ফসল জন্মানো হয়। তাকে ফসল বিন্যাস বা ফসল ফলানো পদ্ধতি বলে।

ফসল ও কৃষি পদ্ধতি বলতে এক্ষেত্রে ফসল ফলানোর পদ্ধতি বা শস্যের বিন্যাস (Cropping Pattern) বুঝানো হয়েছে। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি জমিতে এক বছরে বিভিন্ন ফসল জন্মানো হয় তাকে ফসল বিন্যাস বা ফসল ফলানোর পদ্ধতি বলে। যে কোন দেশে ফসল ফলানোর পদ্ধতি কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলো হলো ঃ

ক. আবহাওয়া অর্থাৎ তাপ, বৃষ্টিপাত, আলো ইত্যাদি।
খ. ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ ভূমির অবস্থা, উচুঁ-নিচু ইত্যাদি।
গ. মাটির অবস্থা অর্থাৎ উর্বরতা, অনুবর্রতা ইত্যাদি।
ঘ. ফসল যেগুলো সহজে উৎপন্ন করা যায়।
ঙ. ফসল যেগুলো সহজে লোকে ব্যবহার করে।
চ. ফসল যেগুলো সহজে বাজারজাত করা যায়।

বাংলাদেশে ফসল ফলানোর প্রচলিত পদ্ধতি

জমির উচ্চতা অনুযায়ী বছরে দুটি থেকে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশের কৃষকেরা বংশানুক্রমে তাদের যুগ যুগের অভিজ্ঞতা থেকে কোন ফসল বৎসরের কোন ঋতু, মাটি এবং জমির উপর উপযোগী তাহা শিখেছে। তারা আরো জানে কোন ফসল ফলালে তাদের প্রয়োজন মিটবে এবং আর্থিক লাভবান হতে পারে। সে অনুযায়ী তারা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসল ফলায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে একাধিক ফসল ফলানো হয়ে থাকে। এমন কি নিম্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যেখানে একটি মাত্র ফসল হয় সেখানেও অন্ততঃ বাড়ীর আশেপাশে একাধিক ফসল ফলিয়ে থাকে। নিম্ন অঞ্চলে বোরো ধান এবং গভীর পানির ধান (আমন ধান) চাষ হয়ে থাকে এবং অন্য সব জায়গায় জমির উচ্চতা নির্ণয় করে বৎসরে দুইটি হতে চারটি ফসল উৎপন্ন করা যায়। বাংলাদেশের প্রচলিত ফসল ও কৃষি পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

সারণী ১৩.১০ বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষি ফসল বিন্যাস

জমির ধরন	খরিপ-১	খরিপ-২	রবি
অতি উঁচু জমি	আউশ/পাট	-	সবজি/ডাল জাতীয় ফসল
উঁচু জমি	আউশ/আখ	রোপা আমন	সবজি/আলু/তৈলবীজ ডাল/গম/যব, চীনা বাদাম
মাঝারী জমি	আউশ/পাট	আমন	ডাল/তৈলবীজ/তামাক/পিয়াজ/রসুন/আলু/গম/যব
নীচু জমি	-	গভীর পানির আমন	বোরো
অতি নীচু জমি	-	-	বোরো

বাংলাদেশের ফসল ফলানোর প্রচলিত পদ্ধতি কি?

পরিবর্তিত ফসল ও কৃষি পদ্ধতি

উফশী ধান প্রবর্তন হওয়ায় ফসল ও কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলাদেশে ফসল ও কৃষি কর্মের যে পদ্ধতি চলছিল তা অতি ধীর গতিতে পরিবর্তির্ত হয়েছে। FAO (Food & Agiculture Organization) একই জমিতে বৎসরে অনেকগুলো ফসল ফলাইবার পদ্ধতির উপরে জোর দিয়ে থাকে। অনেক দেশেই এরূপ পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই পদ্ধতির উপর জোর দেয়ার কারণ হলো বাংলাদেশে ফসল ফলানোর জমি বর্ধিত করার ক্ষমতা সীমিত। কাজেই উৎপাদন বাড়াতে হলে যে সকল জমিতে চাষাবাদ হয় তার ফলন বাড়াতে হবে এবং ফলন বাড়াতে হলে উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য, উন্নত প্রথার সেচ ব্যবস্থা, সারের ব্যবহার এবং একই জমিতে বৎসরে অনেক গুলো ফসল বা একাধিক ফসল ফলাবার পদ্ধতি কাজে লাগানো। যে সকল এলাকায় শুধুমাত্র একটি ফসল উৎপন্ন হয় সেই সকল স্থানে একের অধিক ফসল ফলানোর চেষ্টা চলছে এবং অনেকাংশে ইহা সফল হয়েছে। একটি মাত্র ফসল উৎপাদনের সমস্যা হচ্ছে কোন কারণে যদি ফসলটি নষ্ট হয় তবে কৃষকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দূযোর্গ প্রবন দেশ তাই এ সমস্যা খুব বেশী। যদি একটির পরিবর্তে একাধিক ফসল ফলানো যায় তবে কৃষকেরা এ ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে চাষযোগ্য জমি প-াবন থেকে শুস্ক রেখে সারা বছরই বিভিন্ন ফসল ফলানো হচ্ছে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ধানের (HYV) প্রচলন হওয়ায় কৃষি ও ফসল ফলানোর পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হচ্ছে তাই বাধ্য হয়েই উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদন করা হচ্ছে। মূলতঃ কৃষকদের অজান্তেই ধীরে ধীরে কৃষির এই পরিবর্তন ঘটেছে। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে পরিবর্তিত ফসল ফলানোর পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

সারণী ১৩.১১ ঃ পরিবর্তিত ফসল ফলানো পদ্ধতি

জমির ধরন	খরিপ	রবি
অতি উচুঁ জমি	আউশ/পাট	সাক-সবজী/আলু/ডাল তৈল বীজ
উঁচু জমি	আউশ/রোপা আমন পাট/রোপা আমন	গোল আলু/গম/যব/ভূট্রা/বরবটি ইত্যাদি
মাঝারী জমি	উচ্চ ফলনশীল ধান/বাওয়া ধান/উফসী আউশ আমন	তৈলবীজ/গম/উফশী ধান
নীচু জমি	উফশী আমন	উফশী বোরো ধান

বর্তমানে বাংলাদেশের ফসল ফলনোর ধরন পাল্টে গেছে ঠিকই তবে একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ না করে বেশীর ভাগ সময়ে ধান চাষ করা হচ্ছে। এতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই কিন্তু জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বলা যায় বাংলাদেশের কৃষি ও ফসলের ধরনের এ পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে খুব ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না।

বাংলাদেশের বর্তমান ফসল ফলানোর পদ্ধতি কি?

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের আবাদযোগ্য ভূমির প্রায় সবই কৃষির আওতায় আনা হয়েছে। স্বাধীনতার পরপর দেশের মোট কৃষি ভূমির পরিমাণ ছিল ২৯,০৩৯ হাজার একর। পরবর্তীতে (১৯৯৫) তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৩,৪১৩ হাজার একরের মত। জেলা ভিত্তিক ভূমি চাষের নিবিড়তার আয়তনগত বন্টন থেকে সারা বাংলাদেশে বৈচিত্রতা সুস্পষ্ট। ভূমির স্থানীয় উচ্চতা, প-াবন গভীরতা ও মৃত্তিকার গুনাগুনই এ বৈচিত্রের অন্যতম কারন।

বাংলাদেশে কৃষি প্রধান দেশ বিধায় এদেশের কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বাংলাদেশের জনসাধারনের প্রধান পেশা কৃষি এবং খাদ্যের যোগান ও কৃষি থেকে আসে।

ফসল ও কৃষি পদ্ধতি হলো ফসল ফলানোর পদ্ধতি বা শস্যের বিন্যাস। বাংলাদেশের ফসল ফলানোর ধরন বদলে গেছে ঠিকই তবে একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ না করে বেশীর ভাগ সময়ে ধান চাষ করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষি ভূমির পরিমান ছিল -- ।
ক) ৩০,২০৩ হাজার একর খ) ২৯,০৩৯ হাজার একর গ) ৩১,০৪২ হাজার একর

২। ১৯৯৪-৯৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষি ভূমির আয়তন ছিল -- ।
ক) ২৯,০৩৯ হাজার একর খ) ৩২,৪২০ হাজার একর গ) ৩৩,৪১৩ হাজার একর

৩। কৃষিভূমি ব্যবহারে বিভিন্নতা রয়েছে কিসের উপর?
ক) বৃষ্টিপাতের উপরে খ) অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে গ) প্রকৃতি ও প-াবনের উপরে

৪। বাংলাদেশের কৃষি ভূমির সামগ্রীক ব্যবহার লক্ষ্য করলে বৃহৎ দৃষ্টি কোন থেকে কয়টি ভূমি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়?
ক) ২টি খ) ৫টি গ) ৩টি

৫। অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম জনসংখ্যার কত শতাংশ সরাসরি কৃষি কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল?
ক) ৫৫% খ) ৬৫% গ) ৫৬%

৬। GNP র কত শতাংশ কৃষিখাত থেকে আসে?
ক) ৩৮% খ)৩২% গ)৩০%

৭। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ কোন খাত থেকে আসে?
ক) শিল্প খ)মৎস্য গ) কৃষি

৮। বাংলাদেশের খামার বাড়ীর সংখ্যা কত?
ক) ৬৫ লাখেরও বেশী খ) ৭৫ লাখেরও বেশী গ) ৮৫ লাখেরও বেশী

৯। পাট ও পাট জাত দ্রব্য রপ্তানী করে বাংলাদেশ -- ।
ক) ৭২% বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে খ) ৭৫% বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে গ) ৭৮% বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

১০। যে পদ্ধতি অনুসরন করে একটি জমিতে এক বছরে ফসল ফলানো হয় তাকে কি বলে ?
ক) ফসলের ধরন বলে খ) ফসলের অবস্থা বলে গ) ফসলের পদ্ধতি বলে

১১। কৃষি ও ফসল ফলানোর পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে -- ।
ক) উন্নত কীটনাশকের প্রচলনে খ) উন্নত সার ও বীজরে প্রচলনে গ) উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচলনে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. কৃষি ক্ষেত্র থেকে কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়?
২. শিল্পের কাচাঁমাল হিসেবে কিভাবে কৃষি ব্যবহৃত হয় ?
৩. ফসল ও কৃষি পদ্ধতি কি?
৪. বাংলাদেশের ফসল ফলানোর প্রচলিত পদ্ধতি কি?
৫. বাংলাদেশের ফসল ফলানোর বর্তমান পদ্ধতি কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের ফসল ফলানোর প্রচলিত পদ্ধতি ও পরিবর্তিত পদ্ধতির বিবরন দিন।

পাঠ-১৩.৩ ঃ ফসল ঋতু ও শস্যাবর্তন (Crop calender & Crop rotation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ বাংলাদেশের ফসলের ঋতু ও শস্যাবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবেন;

☞ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

চাষের ক্ষেত্রে শস্যাবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এ পাঠে শস্যাবর্তন এবং এর গুরুত্ব ও পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ফসল ঋতু

বাংলাদেশে কৃষি ঋতু তিনটি

প্রতিটি ফসলের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঋতু রয়েছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ধরনের আবহাওয়ায় নির্দিষ্ট ধরণের ফসল জন্মায়। বাংলাদেশে প্রধানতঃ কৃষি ঋতু তিনটি ঃ

(ক) খরিপ-১ ⟶ মার্চ - মে (ফা"গুন - বৈশাখ)

(খ) খরিপ-২ ⟶ জুন - অক্টোবর (জৈষ্ঠ্য - অগ্রাহয়ন)

(গ) রবি ⟶ নভেম্বর - ফেব্রুয়ারী (পৌষ - মাঘ)।

শস্যাবর্তন

একই জমিতে নির্দিষ্ট বিরতিতে কতগুলো ফসল কয়েক বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় জন্মান হলো শস্যাবর্তন।

একই ফসল একই জমিতে পরপর না লাগিয়ে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল লাগানোর পদ্ধতিকে শস্যাবর্তন বলে (Crop rotation)। একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল চাষ করলে ঐ ফসলের উৎপাদন কমে যায়। ভূমিকে বিশ্রাম দিয়ে বা শস্যের পরিবর্তন দ্বারা শস্য উৎপাদন মাত্রার হ্রাস কমানো যায়।

অন্যভাবে বলা যায় কতগুলি ফসল নিয়মিত ভাবে একটির পর একটি অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় জন্মান হলো শস্যাবর্তন। একই জমিতে বছরের পর বছর পাট জন্মালে পাটের ফসল কম হয়। এর কারণ হলো একটি বিশেষ শস্যে বিশেষ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জমি বা মাটির উর্বরতা সঠিকভাবে পর্যায় ক্রমে শস্যের চাষ করে বা পরিমান মত নানা রকম সারের ব্যবহার করে রক্ষা করা যেতে পারে। একজন অভিজ্ঞ চাষী সব সময়ে একই জমিতে একই ফসল দুই বৎসর চাষ না করে শস্যের ধরন পাল্টে দেয়। যেমন- সে খরিপ মৌসুমে একই জমিতে এক বৎসর আউশ ধান ও অন্য বৎসর ঐ জমিতে পাট চাষ করে থাকে।

শস্যাবর্তন কি?

শস্যাবর্তনের উপকারিতা

শস্যাবর্তনের অনেক গুলো উপকারীতা আছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. ইহাতে আগাছা, পোকা এবং রোগ বালাই কম হয়।
২. মাটিতে জৈব পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে সীম জাতীয় শস্য জন্মালে এর পাতা, কান্ড পরে মাটির জৈব পদার্থ বাড়িয়ে দেয়।
৩. এতে জমি পতিত রাখার প্রয়োজন হয় না।
৪. শস্যাবর্তনে গভীর ও অগভীর শিকরযুক্ত শস্য পালাক্রমে জন্মানো যায়। এতে মাটিকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার করা যায়।
৫. উদ্ভিদ মাটি হতে বিভিন্ন পরিমান অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। ঠিকমত শস্যাবর্তন হতে খাদ্যের সুষম বন্টন আশানুরূপ হতে পারে।

শস্যাবর্তনে বর্তমান নিয়ম

জমির উর্বরতা বজায় রাখাই শস্যাবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্যে।

জমির উর্বরতা বজায় রাখাই শস্যাবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের কৃষকেরা প্রাচীন কাল থেকেই শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে চাষ করে আসছে।

যে জমিতে ইক্ষু চাষ করা হয় সেই জমির শস্যাবর্তন নিমোক্ত ধরণেরঃ

১ম বছর ⟶ খরিপ - আউশ ধান
রবি - ইক্ষু রোপন

২য় বছর ⟶ খরিপ - ইক্ষুর বৃদ্ধি
রবি - ইক্ষু কেটে ফেলা

৩য় বছর ⟶ খরিপ - আউশ ধান
রবি - ইক্ষু রোপন

বাংলাদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলে যে পদ্ধতিতে শস্যাবর্তন করা হয়ঃ

১ম বছর ⟶ খরিপ - আউশ ধান
রবি - ইক্ষু

২য় বছর ⟶ খরিপ - ইক্ষু (আগের বৎসরের)
রবি - ইক্ষু

৩য় বছর ⟶ খরিপ - ধান জাতীয়।

যমুনা নদীর পশ্চিম পার্শ্বের প-াবন ভূমিতে দুই বছরের শস্যাবর্তন নিম্নরূপ ঃ

১ম বছর ⟶ খরিপ - আউশ ধান
হৈমন্তিক - আমন ধান
রবি - মাষকলাই

২য় বছর ⟶ খরিপ - পাট
হৈমন্তিক - আমন ধান

এ ছাড়াও এ অঞ্চলে নিম্েক্ত ধরনের শস্যাবর্তন দেখা যায়ঃ

১ম বছর ⟶ খরিপ - পাট
রবি - সরিষা

২য় বছর ⟶ হৈমন্তিক - আমন
রবি - ডাল

বাংলাদেশে কৃষির ঋতু চক্র বা বর্ষপঞ্জী ঃ

১৩.৩.১ ঃ খাদ্য শস্য

এ পাঠে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য শস্য এবং এর উৎপাদনের পরিবেশ, পদ্ধতি, হার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান, গম, তৈলবীজ, ডাল ও ফলমূল।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু কৃষি পদ্ধতি ও সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। ফলে বাংলাদেশ আজও খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। এদেশে কৃষির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর উৎপাদিত খাদ্যশস্য প্রধানতঃ স্বয়ং ভোগী (Subsistance)। অর্থাৎ নিজ প্রয়োজন মিটানোই কৃষির প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্য শস্য গুলো হলো ঃ ধান, গম, তৈলবীজ, ডাল, ফলমূল ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. ধান ঃ বাংলাদেশের কৃষিকে ধান ভিত্তিক কৃষি বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের মোট কৃষি ভূমির শতকরা ৮০ ভাগই ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৪৫৬৭ হাজার একর জমিতে ধান চাষ করা হয়।

উর্বর পলিময় কাদাযুক্ত মৃত্তিকা ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। প্রতিবছর প-াবনে দেশের প-াবন ভূমি গুলিতে প্রচুর পলি জমে। ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ হলো ১৩° সে. থেকে ৩০° সে. পর্যন্ত এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ১০০ থেকে ২০০ সে.মি. যা বাংলাদেশে বিদ্যমান। এই জন্য বাংলাদেশে খুব ভালো ধান চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রধানতঃ চার ধরনের ধান চাষ হয়। যথা ঃ

ধান
- আউশ
- আমন
- বোরো
- উচ্চফলনশীল (উফশী)

নিম্নের সারণীতে (১৩.১২) বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে ধান চাষের পরিমান এবং উৎপাদনের পরিমান দেখানো হলোঃ

সারণী১৩.১২ ঃ বাংলাদেশের ধান চাষের অধীনে জমি ও উৎপাদনের পরিমান

বছর	জমির পরিমান (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে.টন)
১৯৮৯-৯০	২৫৮৯৩	১৭৮৫৭
১৯৯০-৯১	২৫৭৮৬	১৭৮৫২
১৯৯১-৯২	২৫৩১৫	১৮২৫২
১৯৯২-৯৩	২৫১৫১	১৮৩৪০
১৯৯৩-৯৪	২৪৬৬৪	১৮০৪২
১৯৯৪-৯৫	২৪৫১৭	১৬৮৩৩
১৯৯৫-৯৬	২৪৫৬৭	২৪৫৬৭

উৎস ঃ বিবিএস, ১৯৯৭

আউশ ধান ঃ প্রধানতঃ উচ্চভূমিতে এ ধান চাষ করা হয় (চিত্র ১৩.১২)। তবে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি উর্বর নতুন চরাঞ্চলে ও এ ধান চাষ করা হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে এ ধান বপন করা হয় এবং জুন-জুলাই মাসে ধান কাটা হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত ধানের ২৪% আউশ ধান। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩৮-১০ হাজার একর জমিতে ১৬৭৬ হাজার মেট্রিকটন আউশ ধান করা হয়।

আমন ধান ঃ আমন ধান প্রধানতঃ নীচু জমির ধান (চিত্র ১৩.১২)। বর্ষাকালে যে সকল জমি প-াবিত হয় সে সব জমিতে আমন ধান ভাল জন্মে। আমন ধান মূলতঃ সেই সকল জমিতে জন্মে। বাংলাদেশে সাধারনতঃ দুই প্রকার আমন ধান চাষ করা হয়। যথাঃ রোপা আমন ও ছিটানো আমন (রোপন ও বপন)। প্রায় সকল জেলাতেই এ ধান হয়ে থাকে। এর মধ্যে বরিশাল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোহর পটুয়াখালী প্রভৃতি জেলায় ইহা অধিক পরিমান উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বোরো ধান ঃ বাংলাদেশে নীচু কাদামায় মৃত্তিকাতে বোরো ধান চাষ করা হয়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে যখন পানি কমে যায় তখন এ ধানের চারা রোপন করা হয়। আবার মার্চ - এপ্রিল মাসে কাটা হয়। বাংলাদেশের মোট উৎপন্ন ধানের ২৬% বোরো ধান। বৃহত্তর সিলেটের ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলার হাওড় বাংলাদেশের প্রধান বোরো ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। এছাড়াও বৃহত্তর রাজশাহী এবং বরিশাল অঞ্চলেও বোরো ধানের চাষ হয়।

চিত্র ১৩.১ ঃ বাংলাদেশের বোরো ধান চাষের অঞ্চল

উচ্চ ফলনশীল ধান ঃ গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল ধান (উফশী ধান) চাষ করা হচ্ছে। ইহা মূলতঃ আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (International Rice Research Institute) এর উদ্ভাবিত প্রজাতী। এর সংক্ষিপ্ত নাম ইরি (IRRI) ধান। ইরি ধানে উৎপাদন একর প্রতি ৪০ থেকে ৮০ মন। ইরি ধানের জন্য উত্তাপ এবং সেচ একই সংগে প্রয়োজন হয়। এ জন্য বাংলাদেশে ইহা ভালো ভাবে চাষে করা যায়। নিম্নের ছকে বাংলাদেশে চাষকৃত বিভিন্ন ধরনের উফশী ধান এবং এদের ধরন দেওয়া হলো ঃ

সারণী ১৩.১৪ ঃ বাংলাদেশে চাষকৃত উচ্চফলনশীল ধানের বিবরণ

নাম	ধরন	উৎপাদন (টন/হেক্টর)	নাম	ধরন	উৎপাদন (টন/হেক্টর)
IR8	বোরো	৫.০-৬.৫	BR11 (মুক্তা)	রোপা আমন	৫.৬-৬.০
IR5	রোপা আমন	৪.০-৪.৫	BR12 (ময়না)	বোরো আউশ	৪.৫-৫.৫ ৪.০-৪.৫
BR1চান্দিনা)	বোরো	৪.৫-৫.৫	BR14 (গাজী)	বোরো আউশ	৫.০-৬.০ ৪.০-৫.০
BR2 (মালা)	বোরো	৫.৫-৬.৫	BR17 (হানি)	বোরো	৫.০-৫.৫
BR3 (বিপ-ব)	বোরো	৫.৫-৬.৫	BR19 (মঙ্গল)	বোরো	৫.০-৫.৫
BR4 (বিরি বালাম)	রোপা আমন	৫.৫-৬.৫	BR20 (নিজামী)	আউশ	৩.০-৩.৫
BR5 (বিরি বালাম)	বোরো আউশ	৪.০-৪.৫ ৩.০-৩.৫	BR21 (নিয়ামত)	আউশ	২.৫-৩.০
BR8 (আশা)	বোরো আউশ	৫.০-৫.৫ ৪.০-৪.৫	BR22 (কিরণ)	রোপা আমন	৪.৫-৫.০
BR9 (সুফলা)	রোপা আউশ	৫.০-৫.৫ ৪.০-৪.৫	BR23 (দিশারী)	রোপা আমন	৪.৫-৫.৫
BR10 (প্রগতি)	রোপা আমন	৫.৫-৬.৫	BR5 (ইরিশাইল)	রোপা আমন	৪.০-৫.৫

উৎস ঃ Rashid, 1991.

বাংলাদেশে বর্তমানে দেশী আউশ, আমন ও বোরো চাষ কমে গিয়ে উচ্চফলনশীল আউশ, আমন ও বোরো ধানের চাষ হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশে উৎপাদিত আউশ, আমন ও বোরো ধানের (দেশী ও উফশী উভয় প্রযুক্তির) পরিমান দেওয়া হলো ঃ

সারণী ১৩.১৫ ঃ বাংলাদেশে উৎপাদিত দেশী ও উফশী প্রজাতীর আউশ, আমন ও বোরো ধান (০০০ মেঃটন)

ধান		১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
আমন	দেশী	৪৯২০	৪৬১৪	৪৫৯২	৪৪৬৮	৪০২০	৪১১০
	উফসী	৪২৪৭	৪৬৫৫	৫০৮৮	৪৯৫১	৪৪৮৪	৮৬৮১
আউশ	দেশী	১৬৩০	১৪০৯	১৩৬৪	১১৩০	১০৮৯	৯৭৪
	উফসী	৬৭১	৭৭০	৭১০	৭২০	৭০২	৭০২
বোরো	দেশী	৪০৭	৪৩৭	৩৫০	৩৫৩	৩৩৮	৩৭০
	উফসী	৫৯৫০	৬৩৬৭	৬২৩৭	৬৪১৯	৬২০০	৬৮৫২
	মোট	১৭৮৫২	১৮২৫২	১৮৩৪০	১৮০৪২	১৬৮৩৩	১৭৬৮৮

উৎস ঃ BBS, 1997.

চিত্র ১৩.২ ঃ বাংলাদেশের ধান উৎপাদন অঞ্চল সমূহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ধান হলো বাংলাদেশের প্রধান ফসল। তাই ধান বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (Gross Domostic Product) এ যথেষ্ট অবদান রাখে। নিম্নের সারণীতে এ বিগত কয়েক বছরে ধান বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কি অবদান রেখেছে তা দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.১৬ ঃ বাংলাদেশের জিডিপি-তে ধানের অবদান

সন	জিডিপি (মিঃ টাকা)
১৯৮৯-৯০	৩৫৫৯৮
১৯৯০-৯১	১৫২৬০৮
১৯৯১-৯২	১৫৬২১৫
১৯৯২-৯৩	১২২৫২৬
১৯৯৩-৯৪	১২২৯৩৯
১৯৯৪-৯৫	১৫৫৮৫৯
১৯৯৫-৯৬	১৬০৭০৬
১৯৯৬-৯৭	১৫৮৬২৭

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতেই ধান উৎপন্ন হয়। তবে বরিশাল, সিলেট, পটুয়াখালী, রম্পুর, দিনাজপুর, খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, রাজশাহী কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক পরিমানে ধান চাষ হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সকল প্রকার ধান উৎপাদনে ময়মনসিংহ, রম্পুর, সিলেট যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের অধিকারী।

বাংলাদেশে কি কি ধান উৎপাদিত হয়?

২. গম ঃ গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য। গম নাতিশীতোষক্স অঞ্চলের শস্য। গম চাষের জন্য ২০-২২$^{\circ}$ সে. উষক্সতা এবং ৩৮ থেকে ৭৬ সে.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। গমের চারা বৃদ্ধির সময় আর্দ্র ও শীতল জল বায়ু এবং পাকার সময়ে উষক্স ও শুস্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গমের বীজ বপন করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে গম কাটা হয়। গমের খাদ্যমান ধানের চেয়ে ভাল এবং শীতকালীন ফসল হওয়ায় বন্যা কিংবা খরার চেয়ে নষ্ট হওয়ার ভয় কম থাকে। তাই, গত ২ দশকে গম চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকারীভাবে ও বর্তমানে গম চাষে উৎসাহ প্রদান এবং সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটায় গমের চাষ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট ১৬৭১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হয়। এর মধ্যে মাত্র ৪৯ হাজার একর ছিল স্থানীয় গমের অধীনে আর অবশিষ্ট ১৬২২ হাজার একরই ছিল উফশী গম ক্ষেত। স্থানীয় গমের উৎপাদন ১৮ হাজার টনে সীমিত ছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশে দেশে প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৯ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়।

গম চাষের উপযুক্ত পরিবেশ কি?

৩. যব ঃ বাংলাদেশে যবের উৎপাদন খুব কম। যে সকল অঞ্চলের ভূমি সমতল এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০ সে.মি. এর কম সাধারণত সেই সকল অঞ্চলে যব ভালো জন্মে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ৮৬ হাজার ৪০০ একর ভূমিতে যবের চাষ হয়েছিল; উৎপাদন ছিল ১৭.৫ হাজার টন। ১৯৮৪-৮৫ সালে ২০ হাজার একর জমিতে ৫ হাজার টন যব উৎপাদন হয়। আবার ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৩ হাজার একর জমিতে ৬ হাজার টন যব উৎপাদন হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, যবের উৎপাদন দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলের উত্তর মধ্য অংশ মহানন্দা-গঙ্গা দোয়াব, উত্তর অঞ্চলের গঙ্গার পূর্বপার্শ্বের পাদদেশীয় অঞ্চলে যবের চাষ হয়। মানচিত্র ১৩.৭ এ যবের উৎপাদন দেখানো হলো। যমুনা ও ধলেশ্বরী দোয়াবে ও যবের চাষ হয়। নিম্নে সারণী ১৩.৭.৫ এ বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরে যব চাষের পরিসংখ্যান দেওয়া হলোঃ

সারণী ১৩.১৭ ঃ বাংলাদেশে যব চাষের ভূমি ও উৎপাদন

বছর	চাষকৃত জমি (০০০ একর)	উৎপাদন (০০০ মে. টন)
১৯৮৮-৮৯	৪৬	১১
১৯৮৯-৯০	৪৬	১২
১৯৯০-৯১	৪৪	১১
১৯৯১-৯২	৪০	১০
১৯৯২-৯৩	৩০	৮
১৯৯৩-৯৪	২৫	৬
১৯৯৪-৯৫	২৩	৬
১৯৯৫-৯৬	২৩	৬

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশে কি পরিমান যব উৎপাদিত হয়?

৪. ভূট্টা ঃ বাংলাদেশে ভূট্টার চাষ খুবই নগণ্য। পাবর্ত চট্টগ্রামে সাধারণতঃ জুম চাষে বোজা, মাখী ও বিন্নি এই তিন ধরনের ভূট্টা জুম চাষের সাথে চাষ করা হয়। এ ছাড়া রম্পুর, দিনাজপুর ও চট্টগ্রামে ও ভূট্টার চাষ করা হয়। নিম্নে বাংলাদেশে কয়েক বছরে উৎপাদিত ভুট্টার পরিমান দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.১৮ ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত ভূট্টা

বছর	চাষকৃত ভূমি (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে. টন)
১৯৮৮-৮৯	৯	৩
১৯৮৯-৯০	৮	৩
১৯৯০-৯১	৮	৩
১৯৯১-৯২	৭	৩
১৯৯২-৯৩	৭	৩
১৯৯৩-৯৪	৭	৩
১৯৯৪-৯৫	৭	৩
১৯৯৫-৯৬	৭	৩

উৎস ঃ BBS, 1997.

৫. ডাল ঃ বাংলাদেশের সর্বত্রই কম বেশী ডাল উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মুসুর, মুগ, মাষ, ছোলা, খেসারী, অড়হড় ইত্যাদি ডাল উৎপন্ন হয়। সব রকম ডালই সীম গোত্রের। এ ফসল, মূলের সাহায্যে বায়ু মন্ডলস্থ নাইট্রোজেন ধরে রেখে মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এছাড়া ডাল প্রোটিন প্রধান খাদ্য। এর প্রোটিনের পরিমান চালের তিনগুন ও গমের দ্বিগুন।

বাংলাদেশে মুসুর, মুগ, মাষকলাই, ছোলা, মটর, ঘেসারী, অড়হড় ইত্যাদি ডাল উৎপন্ন হয়।

৫.১ মুসুর ঃ মুসুর ডাল কর্দম যুক্ত মৃত্তিকায় ভালো জন্মে। অক্টোবর-নভেম্বরে বপন করে মার্চ-এপ্রিল মাসে এ ফসল কাটা হয়। বাংলাদেশে প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলের উত্তর অংশে, উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে মুসুর ভালো জন্মে।

৫.২ মুগ ঃ মুগের ডাল সাধারণতঃ দোয়াশ মাটি যার pH ৫.৮ থেকে ৬.৫ সেই মাটিতে ভালো জন্মে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বপন করা হয় এবং ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে কাঁটা হয়।

৫.৩ মাষকলাই ঃ সেপ্তেম্বর-অক্টোবর মাসে আউশ বা পাট কাটার পর জমি থেকে পানি চলে যাবার সাথে সাথে বপন করা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে কাটা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের উত্তরপূর্ব অংশ, উত্তর অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মাষকলাই ভালো জন্মে।

৫.৪ ছোলা ঃ অন্যান্য ডালের মত ইহা রবি ফসল। ইহা ও অক্টোবর-নভেম্বর বপন করে মার্চ-এপ্রিলে কাটা হয়। এই ডাল তিন ধরনের রয়েছে, বাদামী, হলুদ এবং সাদা।

৫.৫ অড়হড় ঃ অড়হড় এপ্রিল-মে মাসে আউশ ও বাজরার সাথে বপন করা হয়। এই ফসল গুলি কাটার পর অরহর বাড়তে থাকে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কাটা হয়। ইহা খুব অল্প পরিমানে চাষ করা হয়।

নিম্নে বাংলাদেশের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের ডালের উৎপাদনের পরিমান দেখানো হলোঃ

সারণী ১৩.১৯ ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত ডালের পরিমান

সন	ডাল উৎপাদন (০০০ মে. টন)				
	মুসুর	মুগ	ছোলা	মাষকলাই	অরহর
১৯৮৯-৯০	১৫৫	৩২	৭০	৫২	৩
১৯৯০-৯১	১৫৭	৩২	৭১	৫২	৩
১৯৯১-৯২	১৫৩	৩২	৬৫	৫০	৩
১৯৯২-৯৩	১৬৩	৩১	৬৩	৫১	৩
১৯৯৩-৯৪	১৬৮	৩০	৬২	৫২	৩
১৯৯৪-৯৫	১৬৮	৬২	৬২	৫৩	৩
১৯৯৫-৯৬	১৭০	৩২	৬১	৫০	৩

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশে কি কি ডাল উৎপন্ন হয়?

৬. তৈলবীজ ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী প্রভৃতি তৈলবীজ বাংলাদেশের সর্বত্র উৎপাদিত হয়। সরিষা, তিসি, জোয়ার সবই রবি শস্য। তৈলবীজে বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কারণ প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমান ভোজ্য তেল আমদানী করতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

বাংলাদেশে সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী ইত্যাদি তৈলবীজ উৎপন হয়।

৬.১ সরিষা ঃ বর্ষার পানি জমি থেকে সরে যাবার সাথে সাথে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সরিষার চাষ হয়ে থাকে এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে সরিষা ঘরে তোলা হয়। বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের উত্তর অংশ বীরগঞ্জ থেকে গাইবান্ধা এবং দক্ষিণ অংশে করোতোয়া এবং বাঙ্গালী নদীর মাঝে সরিষা ভালো জন্মে।

৬.২ তিল ঃ সরিষার পরেই খাবার তেলের শস্য হিসেবে তিলই প্রধান। প্রায় সব রকম জমিতেই ইহা চাষ করা হয়ে থাকে। এই শস্যের বিশেষ গুন হলো শুকনা ও খরা অবস্থায় জমিতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলের মধ্য ও পূর্ব ভাগে তিল ভালো জন্মে।

৬.৩ তিসি ঃ তিসি শীতকালে কোন কোন জেলায় জন্মানো হয়। পানি সরানোর সাথে সাথে ইহা বপন করা হয়ে থাকে।

৬.৪ চীনাবাদাম ঃ চীনাবাদাম উর্বর বালি মাটিতে ভালো জন্মে রবি মৌসুমে ইহা চাষ করা হয়ে থাকে। উঁচু জায়গায় খরিপ মৌসুমেও ইহা চাষ করা হয়। যমুনা ও মেঘনার চর এলাকায় ব্যাপক বাদামের চাষ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে কি কি তৈলবীজ উৎপন্ন হয়?

৭. মসলা ঃ বাংলাদেশে পেয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা প্রভৃতি মসলা প্রচুর পরিমানে চাষ হয়। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন বছরে পেয়াজ মরিচ ও রসুনের উৎপাদন দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.২০ ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত মসলার পরিমান

বছর	উৎপাদন (০০০ টন)		
	পেয়াজ	মরিচ	রসুন
১৯৮৯-৯০	১৪৮	৫১	৪৫
১৯৯০-৯১	১৪৩	৫২	৩৮
১৯৯১-৯২	১৪৪	৫১	৪০
১৯৯২-৯৩	১৪০	৫৪	৩৯
১৯৯৩-৯৪	১৪৪	৫৪	৪০
১৯৯৪-৯৫	১৪২	৫৩	৪০
১৯৯৫-৯৬	১৩৮	৫২	৩৯

উৎস ঃ BBS, 1997

৮. ফলমূল ঃ বাংলাদেশে আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন ফলের অহরণের কাল দেওয়া হলো ঃ

প্রধান ফলমূল আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, পেয়ারা।

ফলের	ফলনশুরু	আহরণ
আম	ফেব্রুয়ারী - মার্চ	মে - আগষ্ট
আনারস	ফেব্রুয়ারী - মার্চ	মে - জুলাই
লিচু	ফেব্রুয়ারী - মার্চ	মে - জুন
লেবু	ফেব্রুয়ারী - মার্চ	আগষ্ট - অক্টোবর
কাঁঠাল	মার্চ - মে	মে - জুলাই
পেয়ারা	সারা বছর	জুলাই - সেপ্তেম্বর
কলা	সারা বছর	ফেব্রুয়ারী - মার্চ
পেঁপে	সারা বছর	

নিম্নের সারণীতে বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন ফলের উৎপাদনের হার দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.২১ ঃ বাংলাদেশে ফল উৎপাদনের পরিমান

ফল	**উৎপাদন (০০০ মে. টন)**					
	১৯৯০-৯১	**১৯৯১-৯২**	**১৯৯২-৯৩**	**১৯৯৩-৯৪**	**১৯৯৪-৯৫**	**১৯৯৫-৯৬**
কলা	৬২৮	৬২৬	৬৩৬	৬৩২	৬৩০	৬৩৪
আম	১৭৯	১৪৩	১৮৪	১৮৪	১৮৯	১৮৬
আনারস	১৬২	১৫০	১৮৪	১৪৯	১৪৯	১৪৯
কাঁঠাল	২৫৩	২৫৫	২৫৭	২৬৫	২৫৬	২৬৫
পেঁপে	২৮	৩০	৩২	৩৫	৩৬	৩৮
পেয়ারা	২৪	২৫	২৭	২৯	৩১	৪০
অন্যান্য ফল	২০	২০	২১	২১	২১	২১

উৎস ঃ BBS, 1997.

এসব খাদ্য শস্য ছাড়াও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গোলআলু, মিষ্টি আলু, কাউন, চিনা, বাজরা চাষ করা হয়। তবে, গত দুই দশকে প-াবনভূমির বৃহৎ অংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের আওতায় আসায় কৃষি ফসল আবাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বিশেষতঃ খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন খুবই লক্ষ্যনীয়। বর্তমান তিল, মিষ্টি আলু, কাউন ও চীনা চাষ খুবই হ্রাস পেয়েছে। এসব খাদ্য শস্য চৈতালী ফসল হিসাবে চাষ হতো। বর্তমানে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে কৃষক এ সব চৈতালী ফসলের পরিবর্তে ইরি ধানের চাষে অধিক আগ্রহী। কারণ ইরির একর প্রতি উৎপাদন বেশী এবং বাজারে চাহিদা সব সময়ই থাকে। চৈতালী ফসলের চাষাবাদ হ্রাস পাওয়ায় একদিকে ফসল বৈচিত্রতা হ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে জমিতে বেশীর ভাগ সময় ধান চাষের আওতায় থাকায় মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি ও হ্রাস পায়। তাই, সার্বিকভাবে কৃষি ফসলের বৈত্রিতা, উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে দেশের খাদ্য উৎপাদনের এ বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষি মূলতঃ স্বয়ংভোগী। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য হচ্ছে ধান। তাই, এদেশের কৃষিকে ধান ভিত্তিক কৃষি বলে। বাংলাদেশে প্রধানতঃ তিন ধরনের ধান চাষ হয়। গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য। যবের উৎপাদন বাংলাদেশে খুবই কম। আর ভুট্টার চাষ এখনও তেমন জনপ্রিয় হয় নাই। ডালের মধ্যে- মুগ, মসুর, ছোলা, মাষকলাই, মটর, অড়হড় এবং তৈলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি, ইত্যাদি চাষ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে প্রধানতঃ কৃষি ঋতু কয়টি ?

ক) ৪টি খ) ২টি গ) ৩টি

২। কতগুলি ফসল নিয়মিত ভাবে একটির পর একটি অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্মান হলো ?

ক) শস্যপদ্ধতি খ) শষ্যাবর্তন গ) শষ্য পর্যায়।

৩। মাটির জৈব পদার্থ বাড়িয়ে দেয় -- ।

ক) দানা জাতীয় শস্য খ) সীম জাতীয় শস্য গ) কান্ড জাতীয় শস্য।

৪। শস্যাবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য -- ।

ক) জমির উর্বরতা বজায় রাখা খ) অধিক ফসল জন্মানো গ) পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা।

৫। বাংলাদেশের কৃষি কি ভিত্তিক?

ক) ধান ভিত্তিক খ) পাট ভিত্তিক গ) গম ভিত্তিক

৬। ধানচাষের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ কত সে.?

ক)১৫ থেকে ৩০ সে. খ)১১ থেকে ৩২ সে. গ)১৩ থেকে ৩০ সে.

৭। বালাদেশের উৎপাদিত ধানের --- ।

ক) ২৪% ইরি ধান খ) ২৪% আমন ধান গ) আউশ ধান ২৪%

৮। ইরি ধানের একর প্রতি উৎপাদন -- ।

ক) ৬০-৮০ মন খ) ৪০-৮০ মন গ) ৮০-১২০ মন

৯। গম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উষক্সতা কত সে.?

ক) ২০-২২ সে. খ) ২১-২২ সে গ) ২০-২৩ সে.

১০। গম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত -- ।

ক) ৩৫-৭৫ সে.মি. খ) ৩২-৭৪ সে.মি. গ) ৩৮-৭৬ ে.সমি.

১১। যব জন্মে সে সব অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত -- ।

ক) ১০ সে.মি. র কম খ) ১২ সে.মি. র কম গ) ১৫ সে.মি. র কম

১২। সরিষার চাষ শুরু হয় -- ।

ক) আগষ্ট- সেপ্তেম্বর থেকে খ) সেপ্তেম্বর- অক্টোবর থেকে গ) অক্টোবর- নভেম্বর থেকে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কি কি ধান উৎপন্ন হয়?
২. উচ্চ ফলনশীল ধান বলতে কি বোঝেন?
৩. বাংলাদেশে কি কি ডাল উৎপন্ন হয়?
৪. বাংলাদেশে উৎপন্ন তৈলবীজের ধরণগুলো কি কি?
৫. বাংলাদেশের ফসল ঋতু গুলোর নাম লিখুন ।
৬. শস্যাবর্তন কি?
৭. শস্যাবর্তনের উপকারীতা কি কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের খাদ্য শস্যের বিবরণ দিন।
২. শস্যাবর্তন বলতে কি বুঝেন? শস্যাবর্তনের নিয়ম ও উপকারিতা বর্ণনা করুন।

পাঠ-১৩.৪ ঃ অর্থকরী ফসল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল কি তা বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসলের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসলের উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সে সকল ফসল অন্যের ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করে অর্থ লাভ করা যায় সেগুলিকে অর্থকরী ফসল বলে। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসলগুলি হলো ঃ পাট, চা, তামাক, ইক্ষু, পান-সুপারী, নারিকেল প্রভৃতি। এ পাঠে বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল অর্থকারী ফসলের উৎপাদনের পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের পরিমান আলোচনা করা হলো।

১. পাট ঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয় পাট উৎপাদনকারী দেশ। পাট প্রধানতঃ নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ এবং নদীর প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাৎকালের দোঁ-আশ মৃত্তিকায় ভালো হয়। পাট উষক্স ও আর্দ্র পরিবেশে ভালো হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নীচু জমিতে পাট বোনা হয় যাতে করে বন্যার পানিতে পাটগাছের মাথাগুলো ডুবে না যায়। মার্চ থেকে যে মাসে আগাম বৃষ্টি হলে ফসল বাড়তে থাকে। পাট গাছ আড়াই থেকে তিন মিটার বা আট থেকে দশ ফুট উঁচু হলেই কাটার সময় হয়। কাটার পরে পাট দশ থেকে বিশ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। এর পরে এর আঁশ ও কাঠি আলাদা করা হয়। বাংলাদেশে তিন ধরনের পাট চাষ করা হয়। যথা ঃ

বাংলাদেশে তিন ধরনের পাট চাষ হয় ঃ মেসতা, তোষা, দেশী।

ক) মেসতা খ) তোষা গ) দেশী

বাংলাদেশের সকল জেলাতেই পাট উৎপাদন হলেও ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুরে সবচেয়ে ভালো পাট উৎপাদন হয়।

নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত পাটের পরিমান এবং চাষকৃত জমি দেখানো হলোঃ

সারণী ১৩.২২ ঃ বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন এবং চাষকৃত ভূমি

বছর	চাষকৃত জমি (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে.টন)
১৯৮৯-৯০	১৩৩৯	৮১২
১৯৯০-৯১	১৪৪২	৯৬২
১৯৯১-৯২	১৪৫৩	৯৫৭
১৯৯২-৯৩	১২৩৬	৮০৮
১৯৯৩-৯৪	১১৮২	৮০৬
১৯৯৪-৯৫	১৩৮৩	৯৬১
১৯৯৫-৯৬	১১৩৩	৭৩৭

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশে কি কি পাট উৎপন্ন হয়?

২. চা ঃ চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে চা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫২টি চা বাগান আছে। এ দেশে মোট ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে ৪০ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫২টি চা বাগান আছে।

চা চাষের জন্য ৫.০-৫.৫ pH সমৃদ্ধ মৃত্তিকা এবং ২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ চা বাগানের pH ৫.৪ থেকে ৫.৯ এবং বৃষ্টি পাত ২৫০ সে.মি.। বেলে মাটি ব্যতীত অন্যান্য প্রবেশ্য স্তর বিশিষ্ট মৃত্তিকার চা-গাছ ভালো জন্মে। মৃত্তিকার গুনাগুনের উপর চা পাতার উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভর করে। পটার্শ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন এ তিনটি উপাদান চা চাষের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে গড়ে একটি চা বাগানের আয়তন ৭২৯ একর এবং অধিকাংশ চা বাগান সিলেট অঞ্চলের দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বাংশে কেন্দ্রীভূত। নিম্নে সারণীতে বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে চা এর উৎপাদন দেখানো হলোঃ

সারণী ১৩.২৩ ঃ বাংলাদেশে চা চাষের পরিসংখ্যান

বছর	চাষকৃত জমি (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে.টন)
১৯৮৯-৯০	১১৭	৮৭৫২৮
১৯৯০-৯১	১১৮	১০২৭৭১
১৯৯১-৯২	১১৮	১৪৫২৩০
১৯৯২-৯৩	১১৮	১০৭৮২৫
১৯৯৩-৯৪	১১৮	১১২৪৪৪
১৯৯৪-৯৫	১১৮	১১৩৪৭৭
১৯৯৫-৯৬	১১৯	১০৫৮২৯

উৎস ঃ BBS, 1997

চা চাষের উপযোগী পরিবেশ কি?

৩. তামাক ঃ বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই কম বেশী তামাক উৎপন্ন হয়। তবে রম্পুর, দিনাজপুর, যশোহর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও ঢাকা অঞ্চলে তামাক ভালো জন্মে। তামাক চাষের জন্য উষব্ধ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। তামাক চাষের জন্য কাম্য তাপমাত্রা হলো ১৮ থেকে ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। গাছ বড় হওয়ার সময় নিয়মিত আর্দ্রতার প্রয়োজন, কিন্তু অতিবৃষ্টি এবং জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বাংলাদেশে তামাক শীত কালীন ফসল। বাংলাদেশে দু ধরনের তামাক উৎপন্ন হয়। যথাঃ

বাংলাদেশে দুই ধরনের তামাক উৎপন্ন হয়।

(ক) যাতী, (খ) মতিহারী

যাতী তামাক দিনাজপুর ও রম্পুরে উৎপন্ন হয়। এটি চুরুট উৎপাদনের কাজে লাগে। মতিহারী, তামাক হুক্কায় ব্যবহৃত হয়। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত তামাক এবং চাষের পরিমান দেখানো হলোঃ

সারণী ১৩.২৪ ঃ বাংলাদেশে তামাক উৎপাদন এবং এলাকার পরিমান

বছর	চাষকৃত জমি (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে.টন)
১৯৮৯-৯০	১১১৩৬৫	৪০৫১৩
১৯৯০-৯১	৯৩৯৫০	৩৩৭৭৫
১৯৯১-৯২	৯০৯১০	৩৪০৮০
১৯৯২-৯৩	৮৯৩২৫	৩৬৯৮০
১৯৯৩-৯৪	৯০৫৪৫	৩৭৭৭০
১৯৯৪-৯৫	৮৯২৮৫	৩৭৭৬০
১৯৯৫-৯৬	৮৯৫২৫	৩৯৩৭৫

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশে তামাক কোথায় কোথায় উৎপাদিত হয় এবং কত প্রকার উৎপাদিত হয়?

৪. ইক্ষু ঃ ইক্ষু চাষের জন্য প্রচুর পরিমান আর্দ্রতার প্রয়োজন। প্রচুর পানির প্রয়োজন হলেও গোড়ায় পানি জমে থাকা ইক্ষুর জন্য ক্ষতিকর। বেঁলে দোঁ-আশ মাটি থেকে আরম্ভ করে আঠালো কাদা মাটি পর্যন্ত নানা ধরনের মাটিতে ইক্ষু চাষ হতে পারে। তবে পলি দো-আঁশ ও কাঁদা দো-আঁশ মাটিতে ইক্ষু ভালো জন্মে। বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, রম্পুর, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। তবে বাংলাদেশে ইক্ষুর উৎপাদন আমাদের চাহিদার তুলনায় কম। তাই প্রতি বছর আমাদের বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমান চিনি আমদানী করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরে ইক্ষুর উৎপাদনের পরিমান দেখানো হলোঃ

পলি দো-আঁশ ও কদা দে-আঁশ মাটিতে ইক্ষু ভালো জন্মে।

সারণী ১৩.২৫ ঃ ইক্ষু উৎপাদিত এলাকা এবং উৎপাদনের পরিমান

বছর	চাষকৃত জমি (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে.টন)
১৯৮৯-৯০	৪৬১	৭৪২৩
১৯৯০-৯১	৪৭২	৭৬৮২
১৯৯১-৯২	৪৬৩	৭৪৪৬
১৯৯২-৯৩	৪৫৬	৭৫০৭
১৯৯৩-৯৪	৪৪৭	৭১১১
১৯৯৪-৯৫	৪৪৫	৭৪৪৬
১৯৯৫-৯৬	৪৩১	৭১৬৫

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে ইক্ষুর উৎপাদন কত?

৫. রেশম ঃ বাংলাদেশে রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ জেলায় রেশম উৎপাদিত হয়। রাজশাহী ও নবাগঞ্জ ২০০০ একর জমিতে তুতেঁর চাষ হয় এবং প্রায় ১৮০০০ কিলোগ্রাম রেশম উৎপন্ন হয়।

৬. তুলা ঃ বাংলাদেশে তুলার উৎপাদন খুবই কম। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চলে কিছু কিছু তুলার চাষ হয়। এ সব তুলার মান খুব একটা উন্নত নয়। নিম্নে বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে তুলার উৎপাদন দেখানো হলোঃ

সারণী ১৩.২৬ ঃ বাংলাদেশে তুলার উৎপাদন

বছর	চাষকৃত জমি (০০০ একর)	উৎপাদনের পরিমান (০০০ মে.টন)
১৯৮৯-৯০	৪৭	৭৭
১৯৯০-৯১	৪৬	৮৮
১৯৯১-৯২	৪৬	৭৭
১৯৯২-৯৩	৪৯	৮৮
১৯৯৩-৯৪	৭৮	১৪৩
১৯৯৪-৯৫	৮১	৭০
১৯৯৫-৯৬	৮৬	৭৬

উৎস ঃ BBS, 1997

৭. **রাবার ঃ** বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাবার উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতি বছর ৯০০ মে. টন কাঁচা রাবার উৎপাদন করা হয়। এছাড়া টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়ে আরো একটি রাবার প্রকল্প সরকার শুরু করেছে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রধান অর্থকারী ফসল হলো পাট। বাংলাদেশে পৃথিবীর শীর্ষ পাট উৎপাদন কারী দেশ। চা দেশের দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল। দেশে রম্পুর, দিনাজপুর, যশোহর, কুষ্টিয়া অঞ্চলে ভালো তামাক জন্মে। বাংলাদেশে ইক্ষুর উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

১। বাংলাদেশের কত ধরনের পাট হয় ?
ক) ২ ধরনের খ) ৩ ধরনের গ) ৪ ধরনের

২। বাংলাদেশের মোট চা বাগানের সংখ্যা কয়টি ?
ক) ১৫০টি খ) ১৫২টি গ) ১৪২টি

৩। চা চাষের জন্য পরিমিত বৃষ্টিপাত কত সে.মি. ?
ক) ২০০ সে.মি খ) ২১০ সে.মি গ) ২৩০ সে.মি

৪। বাংলাদেশে কত ধরনের তামাক উৎপাদিত হয় ?
ক) ৪ ধরণের খ) ৩ ধরণের গ) ২ ধরণের

৫। রাজশাহী ও নবাব গঞ্জের প্রায় -- ।
ক) ১৫০০০ কিলোগ্রাম রেশম উৎপাদিত হয় খ) ১২০০০ কিলোগ্রাম রেশম উৎপাদিত হয়
গ) ১৮০০০ কিলোগ্রাম রেশম উৎপাদিত হয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কি কি পাট উৎপন্ন হয়?

২. চা চাষের উপযোগী পরিবেশ লিখুন ।

৩. তামাক চাষের উপযোগী পরিবেশ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের বিবরন দিন।

১৩.৫ ঃ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষিপণ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কি কি কৃষি পণ্য ব্যবহৃত হয় তা বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের পশুপালন সম্পর্কে ধারনা পাবেন;
- ☞ বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত কৃষি পণ্যকে ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শিল্পের ভিত্তি খুবই সীমিত এবং বেশীর ভাগইকৃষিভিত্তিক। প্রাকৃতিকভাবে, বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের ও ব্যাপক ঘাটতি থাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে উঠে নাই; যা প্রতিবেশী দেশ ভারতে দেখা যায়।

এদেশে যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে তার উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষি পণ্য ভিত্তিক। ভবিষ্যতে, এক্ষেত্রে আরো অনেক শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে। এ পাঠে যে সকল কৃষি পণ্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বর্তমানে যে সব কৃষি পণ্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় থাকে সেগুলোকে প্রধানতঃ ৭টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-১। খাদ্য পণ্য, ২। কাগজ ও মন্ড, ৩। পাটজাত, ৪। চামড়াজাত, ৫। রাবারজাত, ৬। আসবাবপত্র/গৃহস্থলী সামগ্রী, ৭। তামাকজাত, ৮। রেশমজাত/বস্ত্রজাত এবং ৯। ঔষধজাত।

১৩.২৭ নিম্নে সারণীতে এসব কৃষিভিত্তিক শিল্প পণ্যের বিস্তারিত দেয়া হলো

কৃষি পণ্যের ধরন	উৎপাদিত শিল্প পণ্য
১। আখ	চিনি, গুর, স্পিরিট
২। মৌমাছি	মধু, মোম
৩। মৌসুমী ফল	ফলের রস, জেম, জেলি, আচার, ভেষজ, ঔষধ
৪। গম, ভূট্টা	আটা, ময়দা, বেকারী প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য (যেমন- পাউরুটি, বিস্কুট, কেক, সেমাই ইত্যাদি)।
৫। দুগ্ধজাত	দুধ, মাঘন, ঘি, ছানা, মিষ্টি, পনির
৬। মৎস্য	প্রক্রিয়াজাত মাছ, শুটকী
৭। মুদ্রণ ও কাগজ জাতীয়	কাগজের মন্ড/কাগজ,
৮। পাটজাত	কার্পেট, বস্ত্র, বেকিং, ব্যাগ, চট, বস্তা, রশি, সৌখিন দ্রব্যদি।
৯। তৈলবীজ (যেমন- সরিষা, তিল, সোয়াবিন, বাদাম, সূর্যমুখী, জোয়ার, তিসি রেড়ী ইত্যাদি)	ভোজ্য তৈল, বেকারীজাত খাবার ভেষজ ঔষধ
১০। রাবার জাতীয়	পাদুকা, টিউব, টায়ার ইত্যাদি
১১। নারিকেল	নারিকেল তৈল, নারিকেল জাতীয় শুকনো খাবার, ছোবড়া থেকে তৈরীকৃত, রশি, কার্পেট বেকিং, মেট, পাপোশ
১২। তামাকজাত	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা
১৩। রেশম জাতীয়	সিল্ক বস্ত্র, সূতা
১৪। মুড়তা, হোগলা, নল খাগড়া, কাশ, বাঁশ, বেত	মাদুর, পাটি, ঘর সাজানোর জিনিস, আসবাবপত্র
১৫। মসলা জাতীয় (যেমন- জিরা, আদা, ধনে, হলুদ, মরিচ, রসুন, পেয়াজ)।	ভেষজ ও এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ
১৬। হরেতকী, বহেরা, আমলকী	ভেষজ ঔষধ, রঙ শিল্প
১৭। চামড়াজাত	পাদুকা, ব্যাগ, সুটকেস, আসনের কভার, জেকেট
১৮। নিম, ধুতরা, সর্বাগন্ধা, অশ্বগন্ধা, বাসক, ঘৃতকুমারী, শটি	ভেষজ, ঔষধ ও অ্যালপ্যাথিক ঔষধ, প্রসাধন সামগ্রী
১৯। ডিম	প্রসাধন সামগ্রী (যেমন- শ্যাম্পু), বেকারী জাত খাবার
২০। চা গাছ	চা, পচনশীল দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ শিল্প
২১। তুলা	বস্ত্র

এসব কৃষিপণ্যের বেশির ভাগই শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রধান কাঁচা মাল হিসাবে এবং বাকী গুলো আনুসঙ্গিক উৎপাদন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এদেশে প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে বহু অপ্রচলিত কৃষি পণ্যের শিল্প ব্যবহার সম্ভব হবে। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে ফুলের চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। উন্নত প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে তাজা ফুল থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। একইভাবে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, যেমন- গোল আলু, মিষ্টি যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত খাবার রপ্তানির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার ও শিল্পপণ্য হিসাবে রপ্তানি করা সম্ভব হলে কৃষি ও শিল্প উভয়ের বিকাশ ঘটবে। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ভিত্তিক চিনিকল, পাটকল, বস্ত্রকল, হোসিয়ারী, খাদ্যাজাত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, চামড়াজাত শিল্প, ঔষধ শিল্প, তামাক শিল্প গড়ে উঠে।

পাঠ সংক্ষেপ

যে সকল কৃষি পণ্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত কৃষি পণ্যের মধ্যে পাট, ইক্ষু, চা, তামাক ও হিমায়িত মাছ অন্যতম।

১৩.৫.১ ঃ পশু পালন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশে পশুপালনের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশে পশুপালনের সমস্যা বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের জিডিপি -তে পশুপালন খাতের অবদান সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মাংস, দুধ, ডিম, চামড়া, হাড় ইত্যাদি পশু সম্পদ থেকে আসে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মাংস, দুধ, ডিম, চামড়া, হাড় ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য পশু সম্পদ থেকেই আসে। পশু সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও বাংলাদেশে এখনোও আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি-পশু লালন পালনের সুবিধা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় নাই। নিম্নের সারণীতে (১৩.১০.১) বাংলাদেশের GDP-তে গবাদি-পশু খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.২৮ ঃ বাংলাদেশের জিডিপি-তে গবাদি-পশু সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ।

ক্ষেত্র	(মিলিয়ন টাকা)					
	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয়	৭১১০	৭৫৪৮	১০৮৪৮	১১৭৪৩	১৩৬২৯	১৫৮৩৪
মাংস	১৫৫৯৯	১৭৮০১	১৮৮৭৭	২০১৬৫	৩৩৩৯৩	২৫২৫৮
চামড়া জাতীয়	১৭৫৫	১৯৯২	২১৬৫	২৪৫৭	২৮৫২	২৯৬৮
ডিম	২৬৭৭	৩৩২৮	৩১৭১	৪৮৩৫	৫৬১১	৬০৬০
অন্যান্য	৯৭৪	৯৪৪	১০৩০	১১২৮	১৩৭২	১২৩১
মোট	২৮১১৫	৩১৬১৩	৩৬০৯০	৪০৩৭৩	৪৫৫৫৭	৫১৩৫১

উৎস ঃ BBS, 1997

বাংলাদেশে পশু পালনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে পশু পালনের কারণগুলো নিম্নরূপ

ক. বাংলাদেশের কৃষিকাজে জমি চাষের জন্য কৃষকেরা গরু, মহিষ ব্যবহার করে;
খ. পরিবহন কাজের জন্য পশু-পালন করে। এক্ষেত্রে গরু, মহিষ, গাধা ঘোড়া প্রভৃতি কাজে লাগানো হয়;
গ. দুধের চাহিদা মেটাতে গরু, ছাগল, মহিষ পালন করা হয়;
ঘ. মাংসের জন্য গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হাঁস-মুরগী পালন করা হয়;
ঙ. ডিমের জন্য হাঁস-মুরগী পালন করা হয়;
চ. সখের জন্য অনেকে কুকুর, বিড়াল, বানর ও বিভিন্ন প্রজাতীর প্রাণী পালন করে।

বাংলাদেশের পশুপালনের উদ্দেশ্য কি কি?

বাংলাদেশে পশু পালনের সমস্যা

বাংলাদেশে পশু পালনের সমস্যাগুলো নিম্নরূপঃ

ক. বাংলাদেশে পর্যাপ্ত চারণ ভূমির অভাব;
খ. বিভিন্ন পশুর খাদ্যের অভাব;
গ. পশুর চিকিৎসা ব্যবস্থার সুবিধা খুবই সীমিত;
ঘ. পশু পালনে প্রয়োজনীয় মুলধনের অভাব;
ঙ. বাণিজ্যিক ভাবে পশু পালনে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

বাংলাদেশে পশুপালনের সমস্যা কি কি হয়?

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি পশু

১. **গরু ঃ** বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুই প্রধান। তবে বাংলাদেশের গরু উন্নত জাতের গরু নয় এ থেকে খুব বেশী দুধ ও মাংস পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বেশী গরু পালিত হয় ময়মনসিংহ, রম্পুর, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, ফরিদপুর, রাজশাহী ও যশোহর জেলায়। এ সব জেলায় গোচারণের সূযোগ বেশী থাকায় গবাদি পশুর সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। নিম্নের ১৩.২৯ সারণীতে ১৯৮৩-৮৪ সালের গরুর সংখ্যা দেখানো হলোঃ

১৯৯৩-৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট গরুর সংখ্যা ২১,১৭৬।

গরু	সংখ্যা (০০০)
ষাড়	৮১৫৪
গাভী	৮৪০০
মোট	২১১৭৬

উৎস ঃ BBS, 1997.

মহিষ ঃ বাংলাদেশে প্রচুর মহিষ পালন করা হয়। বর্তমানে এর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭০ হাজার। বাংলাদেশে প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলি যেমন- পটুয়াখালী, বরিশাল, খুলনা বাগেরহাট, সাতক্ষীরায় মহিষ বেশী পালন করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলোতেও মহিষ পালন করা হয়। ১৯৮৮--৮৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মহিষের সংখ্যা ৪ লক্ষ্য ৫৭ হাজার।

ছাগল ঃ বাংলাদেশে প্রধানতঃ মাংস ও চামড়ার জন্য ছাগল পালন করা হয়। বাংলাদেশে রাজশাহী, কুমিল্লা, দিনাজপুর, যশোহর নেয়াখালী প্রভৃতি জেলায় ছাগল বেশী পালন করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের ছাগলের সংখ্যা ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।

ভেড়া ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়া ভেড়া পালনে তেমন সহায়ক নয়। তাই বাংলাদেশে পালিত ভেড়ার মান খুব ভালো নয়। ১৯৮৩-৮৪ সালের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের মোট ভেড়ার সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯০ হাজার।

হাঁস-মুরগী ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মোরগ, মুরগী ও হাঁস ঘরে ঘরে পালিত হয়। এছাড়া যেহেতু বাংলাদেশে প্রচুর পুকুর, নদী, খাল রয়েছে তাই প্রচুর হাঁস পালিত হয়। প্রধানতঃ মাংস ও ডিমের জন্য হাঁস-মুরগী পালিত হয়। নিম্নে সারণী ১৯৮৩-৮৪ সালে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা দেখানো হলোঃ

১৩.২৯

হাঁস-মুরগী	সংখ্যা (০০০)
হাঁস	১২০০০০০০
মুরগী	৬৬৩৭১০০০
মোট	৭৮৪৭১০০০

উৎস ঃ BBS, 1997.

বাংলাদেশে কি কি পশু পালিত হয়?

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে পশুপালিত হয় না। এছাড়া পশুপালনে ব্যাপক সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশে পালিত প্রধান পশু গুলো হলো ঃ গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী, মহিষ ইত্যাদি।

১৩.৫.২ কৃষি সমস্যা এবং এর সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাসমূহ বলতে পারবেন;

☞ বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাসমূহ বলতে পারবেন।

এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা ও এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীর কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বাংলাদেশের কৃষিতে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পদ্ধতিগত, সমস্যা বিদ্যমান। এ সকল সমস্যার জন্য বাংলাদেশে একর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় খুব কম। আসুন আমরা এবারে বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা গুলো জানি এবং এ সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য উপায় ঠিক করি।

বাংলাদেশের কৃষিতে প্রাকৃতিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও পদ্ধতিতেগত সমস্যা বিদ্যমান।

বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে সমস্যা

বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। যে সকল কারণে বাংলাদেশের কৃষি অনগ্রসর সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. **পুরাতন চাষ ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশের কৃষক গণ এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে। আমাদের অনেক কিছু আধুনিক হলেও চাষ পদ্ধতি প্রাচীন রয়ে গেছে। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে ফলন খুব কম হয়।

২. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ঃ** আমাদের সেচ ব্যবস্থা বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। সময় মত প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত এক দিকে যেমন প্রচুর ফলন ঘটায় অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতার কারণে ফলন হয় না। এই জন্য বলা হয় বাংলাদেশের কৃষি মৌসুমী বায়ুর জুয়া খেলা।

৩. **জমির উপ-বিভাগ ঃ** বাংলাদেশের কৃষি ভূমি গুলো এমনিতেই ছোট-ছোট ভাগে বিভক্ত আবার চলক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এ গুলো আরো ভাগ হচ্ছে। এমতাবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ সম্ভব নয়। এ কারণে বাংলাদেশের কৃষি অনগ্রসর রয়ে যাচ্ছে।

৪. **ভূমির উর্বরতা হ্রাস ঃ** আমাদের দেশের বেশীরভাগ জমিই বহুদিন ধরে নিয়মিত চাষ হয়ে আসছে। একই জমি বহুদিন ধরে চাষ হবার ফলে মৃত্তিকার গুনাগুন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেছে।

৫. **প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঃ** প্রতি বছর বন্যা বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এছাড়া জলোচ্ছাস, ঝড়, খরা প্রভৃতি দূর্যোগ প্রলংয়কারী রূপে দেখা দিয়ে প্রচুর ফসল ধবংস করে।

৬. **ভূমিক্ষয় ঃ** ভূমিক্ষয় বাংলাদেশের কৃষির আর একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছর নদী স্রোতে, বন্যা প্রভৃতিতে হাজার হাজার একর উর্বর ভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৭. **জলাবদ্ধতা ঃ** বাংলাদেশের অনেক জমিই জলাবদ্ধতার কারণে চাষের উপযোগী নয়। ইহার পরিমান হলো ৭.৩৪ লক্ষ একর। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৪৬৪টি হাওর, বাওর ও বিল রয়েছে। এই সকল স্থানেই জলবদ্ধতা প্রকট।

৮. **মূলধনের অভাব ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক গরীব এ কারণে তারা প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও সেচের জন্য অর্থের যোগান দিতে পারে না ; কৃষির অনগ্রসরতার এটিও একটি বড় কারণ।

৯. **কৃষি ঋণের অভাব ঃ** বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যাংকের অভাবে কৃষকেরা গ্রাম্য ফরিয়া মহাজনের নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহন করে বিধায় ফসল বিক্রির বেশীর ভাগ টাকা সুদ প্রদানে খরচ হয়।

১০. **উন্নত সার ও বীজের অভাব ঃ** অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উন্নত সার ও বীজ। কিন্তু আমাদের দেশে উন্নত মানের সার ও বীজের অভাব রয়েছে। এ ছাড়া অর্থের অভাবে কৃষকরা ভালো বীজ ও সার ক্রয় করতে পারে না।

১১. **গবাদী পশুর অভাব ঃ** বাংলাদেশের চাষের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গবাদী পশু। বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় গবাদী পশু নেই। আবার যা রয়েছে সেগুলো ও সুস্থ নয়। তাই ইহাও একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

১২. **পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। পরিবহন ব্যবস্থা দূর্বল। এ কারণে যথাসময়ে সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ও কৃষি পণ্য বাজার জাত করা সম্ভব হয় না।

১৩. **ভূমিহীনতা ঃ** বাংলাদেশের প্রায় ৬০ ভাগের অধিক কৃষকই ভূমিহীন। ফলে অন্যের জমিতে মন দিয়ে কাজ করে না। এ কারণে ফলন ও বৃদ্ধি করা সম্ভব না।

১৪. **শস্যের রোগ ও কীট পতঙ্গ ঃ** বাংলাদেশের বেশীর ভাগ কৃষকই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। এ কারণে তারা যথাযথ কীটনাশক ও সার ব্যবহার করে না। মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগের দক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের সুযোগ খুবই সীমিত।

১৫. **ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশের কৃষকেরা একদিকে যেমন- নায্যমূল্য হতে বঞ্চিত অপরদিকে দালাল, ফরিয়া প্রভৃতি মধ্য সত্ত্ব ভোগীদের দৌরাত্বে পণ্য সঠিক বাজারজাত করতে পারে না। অনেক সময় কৃষি পণ্যের উৎপাদন মূল্যও পায় না। তাই, কৃষিতে আগ্রহ কমে আসছে।

বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার সমাধান কল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করা যায়ঃ

১. **আধুনিক চাষ ব্যবস্থার প্রচলন ঃ** প্রাচীন পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থা বাদ দিয়ে চাষের আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায়।

২. **আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ** গভীর ও অ-গভীর নলকূপের মাধ্যম আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কমে।

৩. **জমির খন্ড বিখন্ডতা রোধ ঃ** জমির খন্ড-বিখন্ডতা রোধ না করলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ সম্ভব নয়। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে জমির খন্ড-বিখন্ডতা রোধ করতে হবে।

৪. **বন্যা প্রতিরোধ ঃ** বন্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাকৃতির দূর্যোগ প্রতি বছর বন্যার কারণে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষার পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

৫. **সুলভে কৃষি ঋণ ঃ** বাংলাদেশের কৃষকদের মূলধনের অভাব রয়েছে। কৃষি ব্যাংক বা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কৃষকদের চাষাবাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

৬. **উন্নতমানের সার ও বীজের ব্যবস্থা ঃ** এক মাত্র বীজ ও সার প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ১৫ থেকে ২৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। তাই ভালো বীজ ও সার সরবরাহ করতে হবে।

৭. **পানি নিস্কাষন ঃ** জলাবদ্ধ এলাকার পানি নিস্কাষণ এর ব্যবস্থা করে ব্যাপক ভাবে ইরি ও বোরো ধান চাষ করা সম্ভব।

৮. **কীট নাশক ঃ** উন্নত কীটনাশকের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইহা ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষকদের বুঝাতে হবে।

৯. **গুদামজাতকরণ ঃ** বীজ এবং উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণের জন্য ভালো গুদামের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **বাজার ব্যবস্থার উন্নতি ঃ** একটি উন্নতমানের কৃষি বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। এর ফলে কৃষকেরা কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য পাবে এবং কৃষিকাজে আরোও উৎসাহী হবে।

১১. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ** সঠিক পদ্ধতির চাষাবাদ, সেচ, কীট নাশক প্রভৃতি ব্যবহার, ফসল সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করণের জন্য কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গুলি গ্রহণ করলে বাংলাদেশের কৃষিখাতের সমস্যাগুলো বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

কৃষির সমস্যা সমূহ কি? এগুলো কিভাবে সমাধান করা যায়?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ শিল্প -- ।

ক) কৃষি ভিত্তিক। খ) খনিজ ভিত্তিক গ) কোনটিই নয়

২। বর্তমানে যে সকল কৃষি পণ্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে গুলোকে কতভাবে ভাগ করা যায়?

ক) ৫ ভাগ খ) ৬ ভাগ গ) ৭ ভাগ

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশে মোট গরুর সংখ্যা কত ছিল?

ক) ২০২৮৬টি খ) ২১১৭৬টি গ) ২১৫০০টি

৪। বর্তমানে বাংলাদেশে মহিষের সংখ্যা কত?

ক) ৫ লক্ষ ৭০ হাজার খ) ৪ লক্ষ ৭০ হাজার গ) ৫ লক্ষ ৬০ হাজার

৫। ১৯৮৩-৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ছাগলের সংখ্যা কত?

ক) ৮৮ লক্ষ ২০ হাজার খ) ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার গ) ৮৮ লক্ষ ১৮ হাজার

৬। ১৯৮০-৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ভেড়ার সংখ্যা কত?

ক) ৫ লক্ষ ৮০ হাজার খ) ৪ লক্ষ ৯০ হাজার গ) ৫ লক্ষ ৯০ হাজার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কৃষির প্রধান সমস্যা গুলি লিখুন।

২. বাংলাদেশে পশুপালনের উদ্দেশ্য কি?

৩. বাংলাদেশে পশু পালনের সমস্যা কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কৃষি পণ্যের শ্রেণীবিভাগ দেখান এবং এর বিস্তারিত বিবরণ লিখুন।

২. বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় বর্ণনা করুন।

পাঠ-১৩.৬ ঃ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ঃ মিঠা পানি ও সামুদ্রিক মৎস্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
☞ বাংলাদেশের মিঠা পানির এবং সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
☞ পুষ্টি ও অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ
(১) মিঠা পানির মৎস্য
(২) সামুদ্রিক মৎস্য

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান ও প্রিয় খাবার হচ্ছে ভাত ও মাছ। বাংলাদেশে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর, বিল, পুকুর, ডোবা, জলাশয় রয়েছে। তাই এক সময় এ সকল উৎস হতে প্রচুর মৎস্য সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এ সকল উৎস হতে পর্যাপ্ত মৎস্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ সকল আভ্যন্তরীণ উৎস ব্যতীত বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকায় প্রচুর মৎস্য রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সামুদ্রীক মৎস্য পর্যাপ্ত অহরণ করা যাচ্ছে না। তাই এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব কি? মৎস্য সম্পদের ধরন কি? মৎস্য সম্পদের মজুতের পরিমান মৎস্য ক্ষেত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **প্রধান খাদ্য** ঃ মৎস্য বাংলাদেশীদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এছাড়া মৎস্য একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য। মৎসে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা, অন্যান্য খনিজ লবন, ভিটামিন এ এবং ডি, ১৩ থেকে ২০ শতাংশ প্রোটিন এবং ১২ থেকে ১৭ শতাংশ চর্বি জাতীয় পদার্থ রয়েছে। মাছ চর্বি ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ বলে মাংসের বিকল্প রূপে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। তাই মৎস্য বাংলাদেশের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ৮০ ভাগ চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

২. **শিল্পের উপকরণ** ঃ মাছের চামড়া, হাড়, কাঁটা, তেল প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- শুশুক, হাঙ্গর এর তেল ঔষধ, বার্নিশ ও গি-সারিন তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

৩. **কর্মসংস্থান** ঃ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী মৎস্যের সাথে সম্পৃক্ত পেশায় নিয়জিত। সরাসরি মৎস্য অহরণ, শুকানো এবং মৎস্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন** ঃ মৎস্য সম্পদ রপ্তানি করে সরকার প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছই প্রধান এছাড়া শুটকি ও লবন দেওয়া মাছও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

৫. **হাঁস-মুরগীর খাবার** ঃ মৎস্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ হাঁস-মুরগীর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬. **আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নতি** ঃ মৎস্য শিল্পের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নতি হয়েছে। যেমন- জেলে নৌকা ও জাল তৈরীর শিল্প, বরফ ও লবন উৎপাদন শিল্প। এ সকল -আনুষঙ্গিক শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে।

৭. **জাতীয় উন্নয়ন** ঃ মৎস্য সম্পদ জাতীয় উন্নয়নে সথেষ্ট অবদান রাখছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০% মৎস্য ক্ষেত্র থেকে আসে। নিম্মের সারণীতে এ বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের GDP-তে মৎস্যের অবদান দেখানো হলোঃ

সারণী ১৩.৩১ ঃ বাংলাদেশের GDP-তে মৎস্যের অবদান (মি. টাকা)

মৎস্য	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
সামুদ্রিক	৩৭১৯	৩৯৫৬	৪০৭৯	৪২৯৯	৪৯৩৫	৪৭৮২	৯৬৭৯
আভ্যন্তরীণ	২৩৮৫১	২৬৯১১	৩৬০৪৮	৪৪১০৬	৫১৯৭৭	৫৬০৮৮	৬১৮১৭
মোট	২৭৫৭০	৩০৮৬৭	৪০১২৭	৪৮৪০৫	৫৬৯১২	৬৪৮৭০	৭১৪৯৬

উৎস ঃ BBS, 1997.

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব কি কি?

মিঠা পানির বা আভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্র

মোট ধৃত মৎস্যের ৭৩% মিঠা পানির বা অভ্যন্তরীণ জলাভূমির মৎস্য।

বাংলাদেশের মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র গুলি হলো নদী-নালাা, খাল-বিল, হাওর-বাওর, পুকুর ডোবা ইত্যাদি। মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ ১০ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য শিকার করে থাকে। বাংলাদেশের মোট ধৃত মৎস্য ৭৩% এ সব ক্ষেত্র থেকে ধরা হয়। ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার লোক মিঠা পানির মৎস্য অহরণে জড়িত।

মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে উঠার কারণ

১. প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা মৎস্যের প্রজননে সহায়ক।
২. পর্যাপ্ত নদ-নদী ও জলাভূমি রয়েছে যা মৎস্য ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. বর্ষাকালে মাছের খাদ্যের প্রাচুর্যতা।
৪. বর্ষাকালে কৃষিক্ষেত্র সমূহ প-াবিত হয় যা মৎস্য ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫. দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্রের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্রগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(ক) নদী ও খাল ঃ বাংলাদেশের মাছের ২৭% আভ্যন্তরীণ নদী ও খাল থেকে আহরণ করা হয়। নদী ও খালে সারা বছর পানি থাকে বর্ষাকালে পানি ঘোলা থাকে যা মৎস্যের প্রজননে সহায়ক। নদীগুলো থেকে ইলিশ, রুই, কাতলা, বোয়াল, সরপুটি, কালবাউশ, চিংড়ি, পাঙ্গাস, আইড় ইত্যাদি মাছ ধরা হয়। নিম্নে বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা গুলির নদী ও খালের থেকে ধৃত মৎস্যের পরিমান দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.৩২ ঃ নদী ও খাল থেকে ধৃত মৎসের পরিমান (১৯৯৪-৯৫)

বৃহত্তর জেলা	ধৃত মৎসের পরিমান (মে. টন)
চট্টগ্রাম	২০৪৫০
কুমিল্লা	১৫৩৭৪
নোয়াখালী	৩১৭০৬
সিলেট	৩৫৬৫
ঢাকা	৩১০৯
ফরিদপুর	৫১৭২
জামালপুর	৬২৫
ময়মনসিংহ	৭৪৪৪
টাঙ্গাইল	১১৭১
বরিশাল	৪১১৭০
যশোহর	১১৪১
খুলনা	৩৯৯৪
কুষ্টিয়া	৪৪৬
দিনাজপুর	৬৪
পাবনা	৪০০৬
রাজশাহী	৪১২৯
মোট	১৫২৭৮২ (১৬.৮২%)

উৎস ঃ BBS, 1997.

(খ) পুকুর ও দীঘি ঃ বাংলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ পুকুর রয়েছে। এ সকল দীঘি মৎস্য চাষে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সাবেক বরিশাল, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় পুকুরের সংখ্যা বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে এই সকল পুকুর হতে ২৬৭২৮২ মেট্রিক টন মৎস্য ধরা হয় যা মোট ধৃত মিঠা পানির মৎস্যের ২৯.৪%।

(গ) বিল ও হাওড় ঃ বাংলাদেশে মোট বিল ও হাওরের সংখ্যা হলো ২৪৬৪টি। এ সকল হাওর বিল হতে শিং, মাগুর, কৈ, টেংরা, পাবদা, পুঁটি, বোয়াল, শোল ইত্যাদি মাছ ধরা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে বিল ও হাওড় থেকে ৫৮২৯৮ মে. টন মাছ ধরা হয় যা মোট ধৃত মিঠা পানির মৎস্যের ৬.৪%।

(ঘ) শস্যক্ষেত্র সমূহ ঃ বর্ষাকালে শস্য ক্ষেত্র সমূহ প-াবিত হলে প্রচুর মৎস্য ধরা হয় ১৯৯৪-৯৫ সালে এ ক্ষেত্র থেকে ৩৬৭৫৪৮ মে. টন মাছ ধরা হয় যা মোট ধৃত মিঠা পানির মৎস্যের ৪০.৪%।

(ঙ) কৃত্রিম জলাশয় ঃ রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেক দেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়। প্রতি বছর এখান থেকে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে এখান থেকে ৫৫৫৬ মে. টন মাছ ধরা হয়, যা মোট ধৃত মিঠা পানির মৎস্যের .৬১%।

মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র গুলো কি কি?

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মিঠা পানির মৎস্য কেন্দ্র

ক) মানিকগঞ্জের আরিচা
খ) জামালপুরের বাহদুরাবাদ
গ) সিরাজগঞ্জ
ঘ) রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ
ঙ) চাঁদপুর
চ) পাবনার নগরবাড়ী
ছ) বরিশাল।
জ) কিশোরগঞ্জের ভৈরব

মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ

পূর্বে উল্লেখিত ক্ষেত্র সমূহ থেকে বাংলাদেশের মিঠা পানির মৎস্য সংগ্রহ করা হয়। এ সকল ক্ষেত্র থেকে ধৃত মৎস্য সমূহ হলোঃ ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, পাঙ্গাশ, আইড়, চিংড়ি, কই, শিং, মাগুড় প্রভৃতি প্রধান। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪৩৩৭৬৯০ হেক্টর জলজ এলাকা থেকে ৯০৮২১৮ মে. টন. মাছ ধরা হয় যা মোট ধৃত মৎস্যের ৭৭.১৮%। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধৃত মিঠা পানির মাছের পরিমান দেখানো হলো ঃ

সারণী ১৩.৩৩ ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধৃত মিঠা পানির মৎস্য ১৯৯৪-৯৫

মৎস্য ক্ষেত্র	জলজ এলাকা (হেক্টর)	মোট ধৃত সংখ্যা (মে. টন)
নদী ও খাল	১০৩১৫৬৩	১৫২৭৮২
সুন্দর বন	-	৬৯৫১
বিল হাওড়	১১৪১৬১	৫৮২৯৮
কাপ্তাই লেক	৬৮৮০০	৫৫৫৬
প-াবিত ভূমি	২৮৩২৭৯২	৩৬৭৫৫৮
পুকুর	৫৪৮৮	২৪৬০
চিংড়ি ঘেড়	১৩৭৯৯৬	৩১৭০৭৩

উৎস ঃ BBS, 1997.

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র

মোট ধৃত মৎস্যের ২৭% সামুদ্রিক মৎস্য ।

বাংলাদেশের প্রায় ৭৩২ কি. মিটার উপকূল রেখা রয়েছে। এই উপকূল রেখা বরাবর ১০,১১,০০০ হেক্টর এলাকা ব্যাপী সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক ক্ষেত্র নিয়োজিত লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৮২ হাজার এবং ধৃত মৎস্যের পরিমান বার্ষিক ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টন, যা মোট ধৃত মৎস্যের ২৭%। সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে গড়ে উঠার কারণ নিম্নরূপঃ

ক) বাংলাদেশের উপকূল রেখা ভগ্ন বলে বিস্তৃর্ণ এলাকার মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।
খ) অসংখ্য নদীর মোহনা ও খাড়ী রয়েছে।
গ) মিঠা ও নোলা পানির সংগম স্থল খোলা থাকায় মাছের প্রজনন ঘটে।
ঘ) উপকূলের বনভূমি মৎস্য শিকারের নৌকা তৈরীতে সাহায্য করে।
ঙ) উপকূলীয় সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য খাদ্য বিদ্যমান।

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র উঠার কারণ কি কি?

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র

(ক) উপকূলীয় মৎস্য ক্ষেত্র ঃ বাংলাদেশের দীর্ঘ উপকূলে বহু নদ-নদী সাগরে পতিত হয়েছে। এর ফলে এ সব এলাকায় প্রচুর দ্বীপ, নদী মোহনা ও অসংখ্যা খাড়ি বিদ্যমান। ফলে উপকূল রেখা অঞ্চল মৎস্যের বিচরণ ক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। প্রায় ১৮১৩ বর্গ কি. মি. এলাকা ব্যাপী এ মৎস্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এখানে ভেটকি, চান্দা, ইলিশ, ছুড়ি, লটিয়া, কোরাল, চিংড়ি, পোয়া প্রভৃতি মাছ ধরা হয়।

(খ) গভীর সমুদ্রের মৎস্য ক্ষেত্র ঃ বাংলাদেশের উপকূল রেখা হতে গভীর সমুদ্রে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩২০ কি. মি.) পর্যাপ্ত সমুদ্র সীমা বিস্তৃত। এই অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায় কিন্তু পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি ও নৌযানের অভাবে এখান থেকে মৎস্য আহরণ পর্যাপ্ত নয়।

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র কয়টি?

সামুদ্রিক মৎস্য কেন্দ্র সমূহ

ক) চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ
খ) কক্সবাজারের মহেশখালী, টেকনাফ
গ) পটুয়াখালী
ঘ) ভোলা

ঙ) কুয়াকাটা চ) বরগুনা

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এক জরীপে দেখা গেছে বাংলাদেশে সমুদ্র থেকে বার্ষিক ২,৬৪,০০০ থেকে ৩,৭৩,০০০ টন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সম্ভব। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট ২৬৪৬৫০ মে. টন সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হয়। যা মোট ধৃত মৎস্যের ২২.৫%। এ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে এর মধ্যে ৪২ প্রজাতি বাণিজ্যিক ভাবে আহরিত হয়। এ মাছগুলির মধ্যে ছুরি, লক্কা, রূপচান্দা, গলদা চিংড়ি, মাইট্রা, পোয়া, লইট্রা ইলিশ প্রধান।

চিত্র ঃ ১৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মৎস্য কেন্দ্র

১৩.৬.১ ঃ পুষ্টি ও অর্থনীতিতে মৎস্যের গুরুত্ব

এ পাঠে বাংলাদেশে পুষ্ঠি ও অর্থনীতিতে মৎস্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবো। মাছ বাংলাদেশের মানুষের সস্তা প্রানিজ আমিষের প্রধান উৎস ও জাতীয় সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত। সারাদেশে জুড়েই আছে খাল, বিল, নদী-নালা ও পুকুর,

যা স্বাদু মাছ উৎপাদনের জন্য আদর্শ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া, উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে আছে বিপুল সামুদ্রিক মৎস্য স্বাদু ও সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের এসব মৎস্য ভিত্তিক কর্মকান্ডে এদেশের জনগোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ সরাসরি জড়িত। যেমন- মাছ ধরা, চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন সাধন ও বাণিজ্যিক কাজে নিয়োজিত। মোট কথা, কৃষি নির্ভর এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, পুষ্টি জোগানে, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন সেক্টরের সাথে মৎস্যের গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

মৎস্য ও পুষ্টি

মানুষের প্রাণীজ আমিষের ৯৫% মৎস্য থেকে আসে।

মাছে ভাতে বাঙ্গালী এ ধরনের প্রবাদ বাংলাদেশে অনেক পূর্বে থেকেই প্রচলিত আছে। এ কথা থেকেই অনুমান করা যায় যে, অতীতকাল থেকেই বাঙালীর খাদ্য তালিকায় মাছ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আসছে। সাধারন মানুষের প্রানীজ আমিষের শতকরা ৯৫ ভাগই মৎস্য থেকে যোগান হতো। এসব মৎস্যের বেশীরভাগই বিনা পয়সায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠি খাল, বিল, নদী-নালা, জলাভূমি থেকে ধরে নিত। ফলে, তাদের প্রাত্যাহিক আমিষের প্রয়োজনীয়তার তেমন ঘাটতি হতো না। এদেশে মৎস্য গ্রহণের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৩৪ ঃ বাংলাদেশে মৎস্যের বার্ষিক উৎপাদন ও খাওয়ার দৈনিক ও বার্ষিক পরিমান।

বর্ষ	মৎস্য উৎপাদন (০০০ মে. টন)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	দৈনিক খাওয়ার পরিমান (গ্রাম)	বার্ষিক খাওয়ার পরিমান (কিঃ গ্রাম)
১৯৬২-৬৩	৭২০	৬০	৩২.৯	১২.০
১৯৭৫-৭৬	৬৩০	৭৭	২২.২	৬.১
১৯৭৯-৮০	৬৫২	৮৭	২০.৫	৭.৫
১৯৮৭-৮৮	৮২৪	-	২১.০	৭.৬
১৯৯০-৯১	৮৪৭	-	-	-
১৯৯৪-৯৫	১২০০	১২০	২৭	১০.০

উৎস ঃ বিবিএস, ১৯৯৭

উপরের সারণি থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৬২ সাল থেকে পরবর্তী ১৯৮৮ পর্যন্ত মৎস্যের উৎপাদন যেমন- হ্রাস পেয়েছে তেমনি মাথাপিছু দৈনিক মৎস্য খাওয়ার পরিমান পরবর্তীতে মৎস্য উৎপাদন আরো না বাড়াতে পারলে মাথা পিছু খাওয়ার মাত্রার উন্নতি সম্ভব হবে না; ফলে আমিষের ঘাটতি থেকেই যাবে।

মৎস্য অর্থনীতি

জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪.৭ ভাগ মৎস্য খাত থেকে আসে।

বাংলাদেশে মৎস্য কৃষি সেক্টরের আওতাভূক্ত। কৃষি সেক্টরে শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদ থেকে মোট আয়ের শতকরা ৬.৯ ভাগ এসেছে এবং জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪.৭ ভাগ মৎস্য সম্পদের অবদান (বিবিএস ১৯৯৬)। তাছাড়া বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরে প্রায় ২০ লক্ষের অধিক লোক নিয়মিত মৎস্য আহরণে এবং সংশি-ষ্ট অন্যান্য কাজে নিয়োজিত আছে যা মোট কর্মরত জনবলের প্রায় ৭ শতাংশ (World Bank Fisheries Report, 1989)। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণের কাজে সার্বক্ষনিকভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষের অধিক। মাছ পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ এ সেক্টরের বিশেষতঃ বর্ষায় (জুন থেকে অক্টোবর) বহু পুরুষ এবং মহিলা মাছ ধরা পরিবহন ও বিক্রীর কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। অতীতে নিম্ন বর্ন হিন্দুগণই এ পেশায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বহু মুসলমানও এ পেশায় নিয়োজিত আছে। গত এক দশকে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। কারণ, আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। গত ১৯৮০-৮১ সালে উপকূলে মাত্র ৫০০ একর জমি চিংড়ি চাষের আওতায় ছিল। ১৯৯০-৯১ সালে তা বেড়ে ৫ লক্ষ একরে পৌঁছে। চিংড়ি চাষ লাভজনক হওয়ায় মাত্র এক দশকেই এর চাষের আয়তনগত ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে ১ কেজি চিংড়ির দামে বিক্রি হয় ১৫০ কেজি ধান বা পাট। আশা করা যায় উকূলীয় এলাকায় পরিবেশগত বিপর্যয় এড়িয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক চিংড়ি চাষ করা হলে এ ক্ষেত্রে বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে মৎস্য সেক্টরের মাছ, শুটকী ও মাছ জাতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে ধীরে ধীরে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ছে। গত ১৯৮৭-৮৮ সালে এ আয়ের পরিমান ছিল প্রায় ১৬৪ ইউ,এস,ডলার যা বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পরিমানের শতকরা ১১ ভাগ। পরবর্তী মিলিয়ন বছরগুলোতে এ খাতে আয়ের পরিমান নিশ্চিতভাবেই আরো

বেড়েছে। তবে মৎস্য সেক্টরে বাংলাদেশে একর প্রতি মৎস্য উৎপাদন আরো অনেক বেশী বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। বর্তমান উৎপাদন মাত্রা প্রতিবেশী দেশ ভারতের চাইতে ও অনেক কম।

সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মৎস্য বাংলাদেশের সম্পদের আরো উন্নয়নে প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাদু পানির মৎস্য ক্ষেত্র সমূহের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই সাথে উপকূলীয় ও গভীর সামুদ্রিক মৎস্যের সযত্ন আহরণ করা উচিত যাতে অনাগত ভবিষ্যতেও এ সম্পদ আমাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

অর্থনীতিতে মৎস্যের গুরুত্ব কি?

পাঠ সংক্ষেপ

১৯৭২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই মৎস্যের উৎপাদন কমে গেছে। বাংলাদেশে একর প্রতি মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন এবং সুযোগ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাছে চর্বি জাতীয় পদার্থের পরিমান কত?

ক) ১২-১৫% খ) ১২-১৭% গ) ১২-১৮%

২। মৎস্য বাংলাদেশের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের কত ভাগের চাহিদা মিটিয়ে থাকে?

ক) ৮০ ভাগ খ) ৯০ ভাগ গ) ৭০ ভাগ

৩। মৎস্যের উপরে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কত?

ক) ২১ লক্ষ খ) ২২ লক্ষ গ) ২০ লক্ষ

৪। রপ্তানীকৃত মাছের মধ্যে কি মাছ প্রধান?

ক) ইলিশ খ) রূপচান্দা গ) চিংড়ি

৫। বাংলাদেশের মাছের কত ভাগ আভ্যন্তরীণ নদী ও খাল থেকে আহরন করা হয়?

ক) ২৭% খ) ২৫% গ) ২৪%

৬। বাংলাদেশের উপকূল রেখার পরিমান কত কি.মি.?

ক) ৭৩০ কি.মি. খ) ৭২৪ কি.মি. গ) ৭৩২ কি.মি.

৭। সাধারণতঃ মানুষের প্রানীজ আমিষের শতকরা কত ভাগ মৎস্য থেকে আসে?

ক) ৮৫ ভাগ খ) ৯০ ভাগ গ) ৯৫ ভাগ

৮। কৃষি সেক্টরে শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদ থেকে মোট তাদের শতকরা কত ভাগ এসেছে?

ক) ৫.৯ ভাগ খ) ৬.৯ ভাগ গ) ৭.৯ ভাগ

৯। ১ কেজি চিংড়ির দামে কত কেজি ধান পাওয়া যায়?

ক) ১২০ কেজি খ) ১৫০ কেজি গ) ১৭০ কেজি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব কি কি?
২. মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ গড়ে উঠার কারণ কি?
৩. সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র গুলো কি কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র ও মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করুন। মিঠা পানির প্রধান প্রধান মৎস্য কেন্দ্রগুলোর নাম উল্লেখ করুন।